স্বাস্থ্যের বৃত্তে

স্বাস্থ্য ও বিজ্ঞান বিষয়ক সাময়িকী
৮ম বর্ষ ❑ প্রথম সংখ্যা ❑ অক্টোবর-নভেম্বর ২০১৮

সম্পাদক
ডা. পুণ্যব্রত গুণ
ডা. জয়ন্ত দাস

সম্পাদকমণ্ডলী
ডা. পার্থপ্রতিম পাল ❑ ডা. সুমিত দাশ
প্রবীর গঙ্গোপাধ্যায় ❑ ডা. কুশল সেন

সম্পাদকীয় উপদেষ্টা
ডা. অভিজিৎ পাল ❑ ডা.অমিতাভ চক্রবর্তী
ডা. অনুপ সাধু ❑ ডা.আশীষ কুমার কুণ্ডু
ডা. চঞ্চলা সমাজদার ❑ ডা.দেবাশিস চক্রবর্তী
ডা. শর্মিষ্ঠা দাস ❑ ডা.শর্মিষ্ঠা রায়
ডা. তাপস মণ্ডল ❑ ডা.সোহম সরকার

বিন্যাস ও অঙ্গসজ্জা ❑ মনোজ দে, গোপাল সরকার,
ডা. কুশল সেন,
দুনিয়া গঙ্গোপাধ্যায়

প্রচ্ছদ ❑ উৎপল বসু

বিনিময় ২০ টাকা

প্রকাশক
গোপাল সরকার
স্বাস্থ্যের বৃত্তে-র তরফে
দাসপাড়া (আংশিক), পূর্ব বুড়িখালি, বাউরিয়া
উলুবেড়িয়া
হাওড়া ৭১১৩১০

মুখ্য পরিবেশক
বিশাল বুক সেন্টার
৪ টোটি লেন, কলকাতা ৭০০০১৬
ফোন: ৪০৬৪-৪০৯৭/৪১০৩

মুদ্রক
এস এস প্রিন্ট, নরসিংহ লেন, কলকাতা ৭০০০০৯

পেটে ব্যথা

বেশির ভাগ পেটে ব্যথাই তেমন কিছু নয়, নিজে থেকে সেরে যায়। কিন্তু যদি না সারে? সময়মতো ডাক্তার দেখাতে হবে, হাসপাতালে ভর্তি করার দরকার হতে পারে, এমনকী অপারেশনও লাগতে পারে। ৪

যেমন হঠাৎ করে তলপেটের ডানদিকে প্রবল ব্যথা, সেখানে হাত দিলেই রোগী আর্তনাদ করছে। অ্যাপেন্ডিসাইটিস!! দ্রুত অপারেশন না করলে প্রাণসংশয় হতে পারে—লিখেছেন ডা. অনিন্দিতা। ৫

পেটের ডানদিকে বুকের পাঁজরের নীচ থেকে ব্যথা শুরু হয়ে ডানদিকে কাঁধ ও পিঠ পর্যন্ত ছড়িয়ে পড়ছে ব্যথা, ওষুধ দিয়ে কমছে না? অ্যাকিউট কোলেসিস্টাইটিস বা গলব্লাডার (পিত্তথলি)-এর প্রদাহ হতে পারে। থাকতে পারে গলস্টোনও—লিখেছেন ডা. দীপংকর জানা। ৮

হঠাৎ শরীরে অস্বস্তি, জ্বর, প্রচণ্ড পেটে ব্যথা, বমি, পাতলা পায়খানা? বেশি তেল-মশলাদার খাবার বা মদ খাওয়ার পরে, ব্যথা শুরু? অ্যাকিউট প্যাংক্রিয়াটাইটিস হতে পারে, সঠিক চিকিৎসা না পেলে প্রাণহানি হতে পারে—লিখেছেন ডা. কুশল সেন। ১১

পার্টি-সংগঠনের বাইরে থাকা দলীয়-আনুগত্যহীন চিকিৎসকদের ম্যানিফেস্টো

স্বাস্থ্যখাতে সরকারি বাজেট কম। সরকার দয়া করে স্বাস্থ্য পরিষেবা দেন, সরকারি স্বাস্থ্যব্যবস্থা উঠে গিয়ে বেসরকারি ব্যবস্থাই চালু হবে, একথা মানুষ যেন মেনেই নিয়েছেন। যে ব্যবস্থাই হোক, চিকিৎসকরাই তার মুখ—যদিও নীতিনির্ধারণে তাঁদের হাত নেই, মজুরি অন্য পাঁচটা পেশার মতোই। কিন্তু তাঁদের ওপর আছড়ে পড়ে মানুষের ক্ষোভ, নামে শারীরিক মানসিক আক্রমণ। এই অবস্থায় নানা রাজনৈতিক দলের অনুগত ডাক্তাররা দলের মতকেই প্রতিষ্ঠা করার চেষ্টা করছেন। চাই দলীয়-আনুগত্যহীন চিকিৎসকদের নিজস্ব নীতি ও কর্মসূচি—লিখেছেন ডা. সমুদ্র সেনগুপ্ত। ১৫

দুর্গন্ধ: গায়ে ও মুখে

পরিষ্কার থাকলেও মানুষের গায়ে ঘাম থেকে দুর্গন্ধ হয়। অ্যাপোক্রিন ঘর্মগ্রন্থি নিঃসৃত ঘামে জীবাণু সংক্রমণের ফলে গায়ে দুর্গন্ধ কিছু ওষুধে বা আর্সেনিক-বিষণে, বা হাত ও পায়ের চেটো খুব বেশি ঘামলে সেখানে জীবাণু সংক্রমণের ফলে, এক্রিন ঘর্মগ্রন্থির ঘামেও দুর্গন্ধ হয়। এইসব দুর্গন্ধ কমানো সম্ভব, কিন্তু কোনো ম্যাজিক ওষুধ নেই—লিখেছেন ডা. জয়ন্ত দাস। ৩২

মুখ-দাঁত-মাড়ীর রোগে মুখে ও নিঃশ্বাসে দুর্গন্ধ হয়। এছাড়া রসুন, পেঁয়াজ ইত্যাদি খেলে, বিড়ি-সিগারেট, মদ খেলেও দুর্গন্ধ হয়। অনিয়ন্ত্রিত ডায়াবেটিস, ফুসফুসের অসুখ, নাক-গলার সংক্রমণে নিশ্বাসে দুর্গন্ধ হয়। আরও নানা কারণে মুখে ও শ্বাসে দুর্গন্ধ হতে পারে। এই রোগগুলো সারাতে পারলে দুর্গন্ধ দূর করা যায়। ৩৪

স্বাস্থ্যের বৃত্তে পত্রিকায় স্বাস্থ্য ও চিকিৎসা সংক্রান্ত লেখা জনসাধারণের সচেতনতা বৃদ্ধির উদ্দেশ্যে প্রকাশিত হয়। এইসব লেখা পড়ে কেউ নিজের বা অন্যের চিকিৎসা করবেন না, করলে সেই চিকিৎসার ফলে যে অসুবিধা বা বিপদ ঘটতে পারে, তার দায় সম্পূর্ণভাবে সেই সংশ্লিষ্ট ব্যক্তির। *স্বাস্থ্যের বৃত্তে* সেজন্য কোনোভাবেই দায়ী থাকবে না।

সূচিপত্র

সম্পাদকীয়		৩
পেটে ব্যথা		৪
পেটে ব্যথা ও অ্যাপেন্ডিসাইটিস	ডা. অনিন্দিতা	৫
অ্যাকিউট কোলেসিস্টাইটিস	ডা. দীপংকর জানা	৮
অ্যাকিউট প্যাংক্রিয়াটাইটিস	ডা. কুশল সেন	১১
বাচ্চার সন্ধ্যায় পেটে ব্যথা	ডা. সৌম্যকান্তি পণ্ডা	১৪
পার্টি সংগঠনের বাইরে থাকা দলীয়-আনুগত্যহীন চিকিৎসকদের ম্যানিফেস্টো	ডা. সমুদ্র সেনগুপ্ত	১৫
নেপথ্য নায়ক	ডা. সব্যসাচী সেনগুপ্ত	১৯
হাসপাতালের অতিথি	ডা. ঐন্দ্রিল ভৌমিক	২২
কুসুমবাই-সন্দীপ্তাকে মনে রেখে	মেয়েদের স্বাস্থ্যভুবন	২৪
গো স্বাস্থ্য বনাম মায়ের স্বাস্থ্য	ডা. সঞ্জীব মুখোপাধ্যায়	২৫
ডা. হৈমবতী সেন-এর দিনলিপি থেকে	প্রবীর গঙ্গোপাধ্যায়	২৭
গায়ে ঘামের দুর্গন্ধ	ডা. জয়ন্ত দাস	৩২
নিশ্বাসে ও মুখে দুর্গন্ধ	ডা. জয়ন্ত দাস	৩৪
এডিস ইজিপ্‌টাই	ডা. সমুদ্র সেনগুপ্ত	৩৭
প্লান্টার ফাসাইটিস ও পায়ের তলায় ব্যথা	ডা. মৃন্ময়	৩৯
'হার্ট' ব্লক—মানে কী বন্ধ হয়ে যাওয়া?	ডা. অপূর্ব	৪৩
অ্যান্টিবায়োটিকের যুগ শেষ	ডা. অনির্বাণ বিশ্বাস	৪৬
শরীরের রোগ না মনের রোগ	ডা. সুমিত দাশ	৪৯
দেশে বেসরকারি মেডিক্যাল কলেজের লাগামছাড়া খরচের জন্য বিদেশে ডাক্তারি পড়তে যাওয়ার প্রবণতা বাড়ছে	পিয়ালী দে বিশ্বাস	৫১
প্রতিবেদন		
প্যান ৪০ অম্বল কমাতে নাও পারে, মনোসেফ-ও ক্ল্যাভাম-ট্যাক্সিম ও জীবাণু সংক্রমণ নিয়ন্ত্রণ নাও করতে পারে	ডা. পুণ্যব্রত গুণ	৫৪

বাণিজ্যিক নয়, মানবিক

স্বাস্থ্যের বৃত্তে

স্বাস্থ্য, রোগ, চিকিৎসা, বিজ্ঞান ও সমাজ নিয়ে আপনার সহমর্মী দ্বিমাসিক বাংলা পত্রিকা

প্রাপ্তিস্থান

কলেজ স্ট্রিট অঞ্চল

পাতিরাম
বুকমার্ক
পিপলস বুক সোসাইটি
বই-চিত্র
মনীষা গ্রন্থালয়
নিউ হরাইজন বুক ট্রাস্ট

কলকাতার অন্যত্র

অমর কোলে-র স্টল (বিবাদি বাগ)
এস কে বুকস (উল্টোডাঙা)
লেখনী, ২/৪৬ নাকতলা, কলকাতা ৭০০ ০৪৭
কল্যাণদার স্টল (রাসবিহারী মোড়)
বইকল্প (ঢাকুরিয়া)
দুর্বার মহিলা সমন্বয় কমিটি (উত্তর কলকাতা)
জ্ঞানের আলো (যাদবপুর, কলকাতা ৩২)

কলকাতার বাইরে

শ্রমিক কৃষক মৈত্রী স্বাস্থ্য কেন্দ্র (চেঙ্গাইল)
ধানসিড়ি (রায়গঞ্জ)
জাতিস্মর ভারতী (জলপাইগুড়ি, ফোন ৯৯৩২৩৫৪৯৫৮)
প্রয়াস মল্লভুম (লোকপুর, বাঁকুড়া, ফোন ৯৪৩৪২২৭৪৯৯)
মাধব পেপার স্টল (বালুরঘাট বাসস্ট্যান্ড, ফোন ৯৯৩২৫৫২৪৪)
প্রদীপন গাঙ্গুলি (দার্জিলিং, ফোন ৮৫৩৫৮৯৫৩৯২)
আনন্দম (মাথাভাঙা, বরুণ সাহা, ফোন ৯৪৩৪৩৩৭৭৬৮, ৯৭৩৩১১৬৪৪২)
সোমা দত্ত (হাওড়া, ফোন ৯১৪৩২৪৫৯৩৭)
ভারতীয় বিজ্ঞান ও যুক্তিবাদী সমিতি (বাগনান, ফোন ৯৮৩০৬০৩০২৯)
ভারতীয় বিজ্ঞান ও যুক্তিবাদী সমিতি (রাধানগর শাখা, বাঁকুড়া, ফোন ৯৪৭৪৫৬৫০৪৭)

শিয়ালদহ ও হাওড়া মেন সেকশনের বিভিন্ন স্টেশনের বই-এর স্টলে।

পাঠক ও লেখক পত্রিকার লেখার বিষয়ে যোগাযোগ করুন: ৯৮৩০৯২২১৯৪, ৯৩৩১০১২৫৩৭

পত্রিকা পাওয়ার জন্য পাঠক ও এজেন্টরা যোগাযোগ করুন: ৯৮৩০৮৮৬৪৪১, ৯৪৭৭০২৮১৫৭

ইমেল: swasthyerbritte@gmail.com

স্বাস্থ্যের বৃত্তের গ্রাহক হোন।

সডাক গ্রাহক চাঁদা ৬টি সংখ্যার জন্য ১৮০ টাকা।

Swasthyer Britto-র নামে চেক বা ড্রাফট পাঠান এই ঠিকানায়-
এইচ এ ৪৪, সল্টলেক, সেক্টর ৩, কলকাতা ৭০০ ০৯৭
আউটস্টেশন চেকে ৩০ টাকা আরও যোগ করুন

অথবা

NEFT-র মাধ্যমে টাকা পাঠান এই অ্যাকাউন্টে
Swasthyer Britto
A/c No. 0315101025024
Canara Bank, Princep Street Branch
IFSC Code: CNRB0000315

সেদিনই NEFT Transaction Id ও গ্রাহকের নাম-ঠিকানা, ফোন বা SMS করে জানান এই নম্বরে ৯৮৩০৮৮৬৪৪১

সম্পাদকীয়

বছর ত্রিশ-চল্লিশ আগে, আমাদের সার্জারির অধ্যাপকরা বলতেন, পেটের ভেতরটা হল ম্যাজিক বাক্স। অপারেশন টেবিলে রোগীর পেট খুললেই ম্যাজিক। তবে কিনা সেই ম্যাজিক দেখে আনন্দ হবে তা বলা যায় না, দুঃখ হবার সম্ভাবনাই বেশি। ডাক্তার আর রোগী দু-জনেরই বড়ো দুঃখের বার্তা লেখা থাকতে পারে রোগীর পেটের মধ্যে, আর আগেভাগে তা জানার বিশেষ উপায় নেই। এখনকার সার্জারি-অধ্যাপকরা এমন কথা আর তত বলেন না, কেননা এর মধ্যে এসে গেছে আলট্রাসাউন্ড, এসেছে সিটি-স্ক্যান। আগেকার মতন পেট-টেপার ওপর নির্ভর করে পেট খুলে অপারেশন টেবিলে দেখতে হয় না যে, ভেবেছিলেন অ্যাপেনডিক্স, আসলে কোলাইটিস! ম্যাজিশিয়ানকে প্রায় জব্দ করেই ফেলেছি আমরা! কিন্তু যেখানে আলট্রাসাউন্ড নেই, বা সিটি-স্ক্যানের কথা ভাবাও যায় না, সেখানে? সেখানে পেট-টেপা, সেখানে ক্লিনিক্যাল দক্ষতা।

অ্যাপেন্ডিসাইটিস, প্যাংক্রিয়াটাইটিস, কোলেসিস্টাইটিস—এগুলো হল সার্জিকাল ইমার্জেন্সি। সার্জিক্যাল ইমার্জেন্সি মানে এই নয় যে সবগুলোতেই সঙ্গে সঙ্গে পেট খুলে অপারেশন করতে হবে। বরং উলটোটা—এগুলোর অনেক ক্ষেত্রেই অপারেশন করতে পেট খোলাটাই ভুল, বা পেটে ব্যথার সময় অপারেশন করার কথা নয়। তবু যেকোনো মেডিক্যাল কলেজ বা বড়ো হাসপাতালে এদের দেখেন সার্জারি বিভাগের ডাক্তাররা, আর তাঁরাই ঠিক করেন অপারেশন করতে হবে কিনা, আর কখন অপারেশন করতে হবে। রোগী দেখে খুব দ্রুত তাঁদের ঠিক করতে হয় কী রোগ আর কীই-বা তার চিকিৎসা। সুতরাং যেখানে পেট-টেপার ক্লিনিক্যাল দক্ষতাই সম্বল, সেখানে মাঝেমধ্যে পেটের ম্যাজিক-বাক্স তার ভয়ংকর ম্যাজিক দেখিয়ে ছাড়ে।

ডাক্তাররাই অনেক সময় যন্ত্রপাতি ছাড়া রোগ ধরতে হিমশিম খান, সাধারণ মানুষ স্বভাবতই পেটে বেশি ব্যথা হলে অকূল পাথারে ভাসেন। তাই সবারই জেনে রাখা ভালো কী রকম পেট ব্যথা হলে রোগীকে তাড়াতাড়ি করে ডাক্তারের কাছে আনতেই হবে। আর ডাক্তারদের যন্ত্র ছাড়া রোগ ধরার সীমাবদ্ধতাও বুঝতে হবে—আগেকার দিনে পেটে হাত দিয়েই ডাক্তারবাবুরা রোগ ধরতেন বটে, কিন্তু তাঁদের যে ভুল হত না তা নয়, আর সেই ভুল হয়তো ধরা পড়ত অপারেশন টেবিলে, বা ধরাই পড়ত না কোনোদিন। এমনটা কাম্য নয়।

তাই এবারের সংখ্যায় পেট ব্যথা নিয়ে প্রচ্ছদ নিবন্ধ। কখন ডাক্তার ডাকবেন? কীরকম উপসর্গ দেখলে কী রোগ ভাবা যেতে পারে, আর তার জন্য কেমন চিকিৎসা দরকার? ঠিকঠাক চিকিৎসা হলে কোন রোগে কী ফল হবে, আর চিকিৎসায় দেরি হলেই বা কী হতে পারে? আশা করব এই নিবন্ধগুলো পাঠককে পেট ব্যথা নিয়ে অযথা আতঙ্ক কাটাতে সাহায্য করবে, আবার সবরকম পেটব্যথাকে একগোত্রে ফেলে সামান্য ব্যাপার বলে অবহেলা করাও কমাবে।

অন্য প্রচ্ছদ নিবন্ধ দুর্গন্ধের সমস্যা নিয়ে—মুখের দুর্গন্ধ ও গায়ের দুর্গন্ধ। যাঁর গায়ে বা মুখে দুর্গন্ধ তাঁর সামনে এটা নিয়ে আলোচনা করা অভদ্রতা মনে করা হয়, কিন্তু তাঁর পেছনে হাসাহাসি করাটা বেশ জমে; রোগীও টের পান যে তিনি আর পাঁচজনের 'খোরাক'। অথচ মেডিক্যাল পাঠক্রমে এই সমস্যা নিয়ে তেমন পড়ানো হয় না।

শেষ প্রচ্ছদ নিবন্ধটি রাজনৈতিক দলের অনুগত নন, এমন ডাক্তারদের ব্যক্তিগত ও সামূহিক কর্তব্য নিয়ে। মনে হতে পারে, এমন একটা বিষয় নিয়ে ডাক্তারদের মধ্যেই আলোচনা সীমাবদ্ধ রাখা উচিত। কিন্তু ডাক্তারদের কাজ সাধারণ মানুষ নিয়ে। তাই ডাক্তাররা কোন কাজটা করবেন আর কোনটা করবেন না, সেই সিদ্ধান্ত সব মানুষকেই প্রভাবিত করে। সাধারণ মানুষের কথা না ভেবে ডাক্তাররা কর্তব্য-অকর্তব্য স্থির করলে মুশকিল, আর সাধারণ মানুষেরও উচিত ডাক্তারদের অবস্থান নিয়ে তলিয়ে ভাবা, তাঁদের পরামর্শ দেওয়া।

পাঠকের পাঠ-প্রতিক্রিয়ার অপেক্ষায় রইলাম।

পেটে ব্যথা

বেশিরভাগ পেটে ব্যথাই কিছু নয়, আপনা-আপনি সেরে যায় ক-দিনের মধ্যেই। কিছু ব্যথায় ডাক্তারের সাহায্য নিতে হয়, অপারেশনও লাগে কোনো কোনো ক্ষেত্রে। তাই কিছু কথা জেনে রাখা ভালো।

পেটে ব্যথার সাধারণ কারণগুলো

পেটে ব্যথার ধরন	কী কারণে হতে পারে?
পেট ফোলা লাগছে, খুব বাতকর্ম হচ্ছে।	পেটে গ্যাস হয়েছে।
খাওয়ার পর পেট ভরে গেছে ফুলে গেছে মনে হচ্ছে, বুকজ্বালা করছে, অসুস্থ লাগছে।	বদ হজম।
পায়খানা হচ্ছে না।	কোষ্ঠবদ্ধতা।
পাতলা পায়খানা, অসুস্থতা, কখনো বমি।	ডায়ারিয়া বা ফুড পয়জনিং।

কিন্তু পেটে ব্যথার সঙ্গে যদি নীচের উপসর্গগুলো থাকে, তাহলে ডাক্তার দেখিয়ে নিন।

- পেট ব্যথা দ্রুত বাড়ছে।
- পেট ব্যথা বা ফোলা কমছে না বা ঘুরে ঘুরে আসছে।
- ওজন কমছে।
- প্রস্রাবের পরিমাণ হঠাৎ করে বেড়ে গেছে বা কমে গেছে।
- হঠাৎ প্রস্রাব করার সময় ব্যথা হচ্ছে।
- মলদ্বার দিয়ে বা (স্ত্রী) যোনি দিয়ে রক্তপাত হচ্ছে অথবা (স্ত্রী) যোনি থেকে অস্বাভাবিক স্রাব হচ্ছে।
- কয়েক দিনের মধ্যে ডায়রিয়া ভালো হচ্ছে না।

হাসপাতালের ইমার্জেন্সিতে দেখান, যদি—

- হঠাৎ করে প্রচণ্ড পেট ব্যথা হয়।
- পেটে ছুঁলে যদি ব্যথা করে।
- যদি রক্ত বমি হয় বা কফির গুঁড়োর মতো খয়েরি বমি হয়।
- পায়খানার সঙ্গে যদি রক্ত পড়ে অথবা আলকাতরার মতো কালো, আঠালো আর খুব দুর্গন্ধযুক্ত পায়খানা হয়।
- যদি প্রস্রাব করতে না পারা যায়।
- পায়খানা বা বাতকর্ম যদি বন্ধ হয়ে যায়।
- যদি শ্বাসকষ্ট হয়।
- পেটে ব্যথার সঙ্গে যদি বুকে ব্যথাও থাকে।
- যদি আপনার ডায়াবেটিস থাকে আর আপনার বমি হয়।
- যদি পেটে ব্যথায় কেউ মূর্ছা যান।

পেটে ব্যথার অন্য কারণ

নিজে রোগ-নির্ণয় করবেন না, ডাক্তার দেখান।

পেটে ব্যথার ধরন	কী কারণে হতে পারে?
মাসিকের সময় পেট কামড়ে তলপেটে ব্যথা	মাসিকের ব্যথা বা ডিসমেনোরিয়া।
তলপেটের ডান দিকে হঠাৎ ব্যথা।	অ্যাপেন্ডিসাইটিস
অনেক দিন ধরেই পেট কামড়ে ব্যথা, পেট ফাঁপা, ডায়রিয়া বা কোষ্ঠবদ্ধতা	ইরিটেবল বাওয়েল সিনড্রোম (IBS)।
ব্যথা পিঠের পাশ থেকে কুঁচকিতে নামে, বমি ভাব, প্রস্রাব করার সময় ব্যথা।	কিডনিতে পাথর।
তীব্র ব্যথা উপর পেটের মাঝখানে অথবা ডানদিকের পাঁজরের নীচে, অনেকক্ষণ ধরে ব্যথা থাকে।	পিত্তথলিতে পাথর।

তথ্যসূত্র: ব্রিটিশ যুক্তরাজ্যের ন্যাশনাল হেলথ সার্ভিসের রোগীদের জন্য তথ্যের সহায়তায় লিখিত। স্বাস্থ্যের বৃত্তে

পেটে ব্যথা ও অ্যাপেন্ডিসাইটিস

ডা. অনিন্দিতা

হঠাৎ করে পেটে ব্যথা। কাটা পাঁঠার মতো ছটফট করা। আস্তে আস্তে বোঝা যায় তলপেটের ডানদিকে ব্যথাটা বেশি, হাত দিলেই রোগী আর্তনাদ করছে। সাবধান! অ্যাপেন্ডিসাইটিস!! দ্রুত অপারেশন না করলে প্রাণসংশয় হতে পারে।

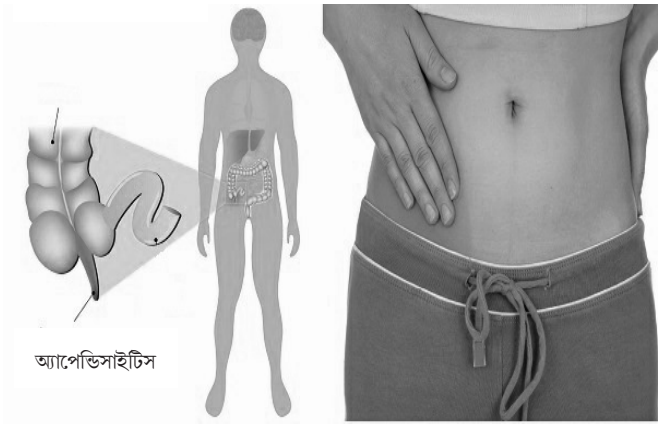

অ্যাপেন্ডিসাইটিস

অ্যাপেন্ডিসাইটিস হল অ্যাপেন্ডিক্স-এর প্রদাহ। এই রোগটি খুবই যন্ত্রণাদায়ক।

আমাদের পেটের মধ্যে খাবার প্রথমে পাকস্থলীতে এসে খানিকটা হজম হয়। তারপর সেই অর্ধপাচিত খাবার বিরাট লম্বা নলের মতো অন্ত্রের মধ্যে দিয়ে যায়। প্রথমে ক্ষুদ্রান্ত্র—নামের মধ্যে ক্ষুদ্র থাকলে কী হবে, এটা বিরাট লম্বা একটা নল, পেটের মধ্যে যেন সাপের মতো কুণ্ডলী পাকিয়ে থাকে। তারপর বৃহদন্ত্র—যা নামে বৃহৎ বটে, লম্বায় কিন্তু অনেক খাটো। ক্ষুদ্রান্ত্রে খাদ্য পাচিত হয়, আর খাদ্যের অধিকাংশ সার পদার্থ শোষিত হয়। ক্ষুদ্রান্ত্র থেকে খাবারের মূলত অপাচ্য অংশ বৃহদন্ত্রে আসে, এবং বৃহদন্ত্রে সেই খাদ্যাবশেষের কিছুটা, বিশেষ করে জলীয় অংশ শোষিত হয়ে মলে পরিণত হয়।

ক্ষুদ্রান্ত্র ও বৃহদন্ত্রের সংযোগস্থল থেকে ২ সেমি নীচে একটি আঙুলের মতো ছোটো অঙ্গ থাকে, লম্বায় ২ থেকে ৩ সেমি। একেই অ্যাপেন্ডিক্স বলে চিনি আমরা। মানব দেহে অ্যাপেন্ডিক্স-এর কাজ ও তার প্রয়োজনীয়তা এখনও অনাবিষ্কৃত। তাই একে নিষ্ক্রিয় অঙ্গ বলা হয়।

কী কারণে অ্যাপেন্ডিসাইটিস হয়?

ঠিক কী কী কারণে অ্যাপেন্ডিসাইটিস হয় তা পুরো স্পষ্ট না হলেও দেখা গেছে বেশিরভাগ ক্ষেত্রে অ্যাপেন্ডিক্স ও বৃহদন্ত্রের সংযোগস্থলের মুখটি মল বা কোনো লসিকা গ্রন্থি (লিম্ফ নোড) বা গোল কৃমি দ্বারা বন্ধ হয়ে গেলে অ্যাপেন্ডিক্সের প্রদাহ শুরু হয়।

কাদের কাদের ক্ষেত্রে অ্যাপেন্ডিসাইটিস-এর সম্ভাবনা বেশি?

দেখা গেছে প্রতি ১৩ জনে ১ জন লোক তাদের জীবদ্দশার কোনো-না-কোনো সময় অ্যাপেন্ডিসাইটিসে ভুগেছেন। সেই ভাবে দেখলে অ্যাপেন্ডিসাইটিস রোগ খুব বেশি দেখা যায়।

অ্যাপেন্ডিসাইটিস-এর উপসর্গগুলো কী?

অ্যাপেন্ডিসাইটিস-এর প্রধান উপসর্গ হল পেটের মাঝ বরাবর পেটে ব্যথা, যা হঠাৎ করে শুরু হয় আবার হঠাৎ করে চলে যায়। প্রায় ঘণ্টাখানেকের মধ্যে ব্যথা পেটের ডানদিকে অনুভূত হতে শুরু করে, সাধারণত সেইদিকেই অ্যাপেন্ডিক্স থাকে, পেটব্যথা দীর্ঘস্থায়ী হয় এবং ব্যথার তীব্রতাও বাড়তে থাকে ।

পেটের ডানদিকে চাপ দিলে, হাঁটলে বা কাশলে অ্যাপেন্ডিসাইটিসের ব্যথা বাড়ে।

এছাড়া অন্যান্য যে উপসর্গগুলি থাকতে পারে তা হল—

- বমিভাব।
- বমি হওয়া।
- খিদে না হওয়া।
- ডায়রিয়া।
- বেশি তাপমাত্রার জ্বর আসা।

কখন ডাক্তার দেখানো জরুরি?

যদি এমনভাবে পেটে ব্যথা হয় যা ধীরে ধীরে সময়ের সঙ্গে সঙ্গে বাড়তে থাকে তাহলে জরুরি ভিত্তিতে চিকিৎসকের কাছে যাওয়া প্রয়োজন।

তবে অ্যাপেন্ডিসাইটিসের ব্যথার সঙ্গে আরও কিছু রোগজনিত পেটে ব্যথার হুবহু সাদৃশ্য আছে। সেগুলি হল—

- গ্যাস্ট্রোএন্টারাইটিস
- ইরিটেবল বাওয়েল সিন্ড্রোম
- কোষ্ঠকাঠিন্য
- ক্রনস ডিজিজ
- পেলভিক ইনফেকশন

মহিলাদের ক্ষেত্রে অনেকসময় অ্যাপেন্ডিসাইটিসের ব্যথা ও মাসিকের সময়ের পেটে ব্যথার মধ্যে পার্থক্য করা যায় না। এছাড়া এক্টোপিক প্রেগন্যান্সিতে যে পেটে ব্যথা হয় তার সঙ্গেও অ্যাপেন্ডিসাইটিস-এর ব্যথার সাদৃশ্য আছে।

মনে রাখতে হবে যেকোনো পেটের ব্যথা যদি টানা অনেকক্ষণ হতে থাকে তাহলে অবশ্যই ডাক্তার দেখানো প্রয়োজন। অনেক সময়েই অ্যাপেন্ডিসাইটিসের ব্যথাকে সহজে শনাক্ত করা যায় না। পেটে ব্যথার কারণ হিসেবে অ্যাপেন্ডিসাইটিস-কে নির্ণয় করা কঠিন হতে পারে, কেননা পেটের ডানদিকে ব্যথা, জ্বর ও বমি—এই তিনটি অ্যাপেন্ডিক্সের আদর্শ উপসর্গ—কিন্তু তিনটি উপসর্গ একসঙ্গে মোট রুগীর মাত্র অর্ধেকের মধ্যে পাওয়া যায়। তাছাড়া অ্যাপেন্ডিক্স-এর অবস্থানেরও তারতম্য হয়। যেমন অনেকের শরীরে অ্যাপেন্ডিক্স বৃহদন্ত্রের পিছনে, আবার অনেকের শরীরে ক্ষুদ্রান্ত্রের কাছে—এভাবে অবস্থানগত তারতম্য থাকায় পেটের ব্যথা সব ক্ষেত্রে তলপেটের ডানদিকে হয় না। এছাড়া আগেই দেখেছি, কিছু রোগের উপসর্গ অ্যাপেন্ডিসাইটিসের সঙ্গে প্রায় অভিন্ন হয়। এর ফলে স্বভাবতই পেটের ব্যথার কারণ হিসাবে অ্যাপেন্ডিসাইটিসকে চিহ্নিত করা কঠিন হয়।

তাই অ্যাপেন্ডিসাইটিসের ব্যথাকে অন্যান্য রোগের থেকে পৃথক করার জন্যে কিছু কিছু পরীক্ষানিরীক্ষা করা হয়। সেগুলি হল—

- কমপ্লিট হিমোগ্রাম: শরীরে সংক্রমণ বোঝার জন্য,
- মূত্র পরীক্ষা: মূত্রথলি বা মূত্রনালীর সংক্রমণ নির্ণয় করার জন্য,
- আল্ট্রাসাউন্ড স্ক্যান: অ্যাপেন্ডিক্স মাস দেখার জন্য।
- সিটি স্ক্যান।

বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই শারীরিক পরীক্ষা করার পর যদি শল্যচিকিৎসক অনুমান করেন পেটের ব্যথার কারণ অ্যাপেন্ডিসাইটিস, তাহলে ইমার্জেন্সি অপারেশন করে অ্যাপেন্ডিক্স বাদ দেওয়ার পরামর্শ দেন। নইলে অ্যাপেন্ডিক্স ফেটে গিয়ে মারাত্মক প্রাণঘাতী জটিলতার সৃষ্টি হতে পারে। আবার কিছু কিছু ক্ষেত্রে শারীরিক পরীক্ষা করে অ্যাপেন্ডিসাইটি-এর জন্যই পেটের ব্যথা হচ্ছে, এমনটা নিশ্চিত না হলে ডাক্তারবাবু ২৪ ঘণ্টা অপেক্ষা করতে বলতে পারেন। এবং এই সময়ের মধ্যে ব্যথা যদি না কমে আরও তীব্র হতে থাকে তাহলে ইমার্জেন্সি চিকিৎসা পরিষেবা নেওয়ার প্রয়োজন আছে।

অ্যাপেন্ডিসাইটিস-এর জটিলতা কী কী?

সঠিক সময়ের মধ্যে অ্যাপেন্ডিসেক্টোমি, অর্থাৎ অ্যাপেনডিক্স বাদ দেবার অপারেশন না করলে, অ্যাপেন্ডিক্স ফেটে সংক্রমণ পেটের মধ্যে সর্বত্র ছড়িয়ে পড়ে। একে বলে পেরিটোনাইটিস। তার থেকে মৃত্যু হতে পারে। পেরিটোনাইটিস থেকে সেপটিসিমিয়া, অর্থাৎ শরীরের সর্বত্র সংক্রমণ ছড়িয়ে পড়তে পারে, এর ফলেও মৃত্যু হতে পারে।

পেরিটোনাইটিসের লক্ষণ ও উপসর্গগুলি হল:

- উচ্চ তাপমাত্রার জ্বর।
- হৃৎস্পন্দনের হার বেড়ে যাওয়া।
- শ্বাসকষ্ট, তার সাথে ঘন ঘন শ্বাস পড়া।
- পেট ফুলে যাওয়া।
- পেরিটোনাইটিস-এর চিকিৎসায় ওপেন সার্জারি ও অ্যান্টিবায়োটিক প্রয়োগ করা প্রয়োজন।

আর একটি জটিলতা হল অ্যাবসেস। অ্যাপেন্ডিক্স ফেটে তার চারপাশে পুঁজ জমা হয়। এর ফলে অ্যাপেন্ডিসেক্টোমির সময় অ্যাপেন্ডিক্স কেটে বার করতে অসুবিধা হয়। অনেক ক্ষেত্রে অ্যান্টিবায়োটিক ব্যবহার করে অ্যাবসেস নিয়ন্ত্রণ করার চেষ্টা করা হয়। দেখা গেছে পুঁজ কৃত্রিমভাবে নালী পথে প্রথমে বের না করে দিলে অ্যাপেন্ডিসেক্টোমি প্রক্রিয়া জটিল হয়। প্রতি ৫০০ জনে ১ জনের অ্যাবসেসের দরুন অ্যাপেন্ডিসেক্টোমি প্রক্রিয়ায় জটিলতা সৃষ্টি হয়।

অ্যাপেন্ডিসাইটিসের চিকিৎসা কী?

কোনো ওষুধ বা মলমের ব্যবহার অ্যাপেন্ডিসাইটিসের চিকিৎসা নয়। এর একমাত্র চিকিৎসা হল অ্যাপেন্ডিক্সকে শরীর থেকে বাদ দেওয়া—এই সার্জারিকে অ্যাপেন্ডিসেক্টোমি বলা হয়। অ্যাপেন্ডিসেক্টোমি দু-ধরনের প্রণালীতে করা যায়।

'কী হোল' সার্জারি বা ল্যাপারোস্কোপিক অ্যাপেন্ডিসেক্টোমি: এতে পেটে কয়েকটি ছোটো ফুটো করে ল্যাপারোস্কোপের সাহায্যে অ্যাপেন্ডিক্স কেটে বাদ দেওয়া হয়। ল্যাপারোস্কোপিক অ্যাপেন্ডিসেক্টোমি তুলনামূলক কম সময়ে হয়ে যায়, এবং রুগীর সুস্থ হতেও কম সময় লাগে। বেশিরভাগ ক্ষেত্রে রুগীকে ২৪ ঘণ্টা পর্যবেক্ষণে রাখার পর ছেড়ে দেওয়া হয়।

আর এক ধরনের অ্যাপেন্ডিসেক্টোমি ওপেন সার্জারির মাধ্যমে করা হয়। এখন যদিও উন্নত দেশে এই প্রণালীতে সাধারণত অ্যাপেন্ডি-সেক্টোমি করা হয় না, তবে কিছু কিছু ক্ষেত্রে ওপেন সার্জারির মাধ্যমে অ্যাপেন্ডিসেক্টোমি করার প্রয়োজন হয়। সেই ক্ষেত্রগুলি হল:

- যদি অ্যাপেন্ডিক্স ফেটে গিয়ে থাকে।
- তাছাড়া যদি কারও আগে ওপেন অ্যাবডোমিনাল সার্জারি হয়ে থাকে।

পোস্ট অ্যাপেন্ডিসেক্টোমি অর্থাৎ অ্যাপেন্ডিক্স কাটার পরে কিছু সতর্কতার কথাও আমাদের খেয়াল রাখতে হবে। সেগুলি হল:

- যদি বারবার বমি হয়;
- জ্বর থাকে;
- সার্জারির পর ক্ষতস্থান থেকে পুঁজ বা রস নিঃসরণ হতে থাকে;
- ক্ষতস্থানে হাত দিলে গরম লাগে;

এই লক্ষণগুলি থাকার অর্থ ক্ষতস্থানের সংক্রমণ বা ইনফেকশন। ফলে সেক্ষেত্রে আবার ডাক্তারি পরামর্শের প্রয়োজন।

অ্যাপেন্ডিসেক্টোমি অপারেশনের পরে সবচেয়ে পরিচিত জটিলতাগুলি হল:

- ক্ষতস্থানে সংক্রমণ;
- হিমাটোমা বা ক্ষতস্থানের চামড়ার নীচে রক্ত জমা;
- ক্ষতস্থানে পুঁজ জমা;
- ক্ষতস্থানে হার্নিয়া—যাদের ক্ষেত্রে ওপেন সার্জারির মাধ্যমে অ্যাপেন্ডিসেক্টোমি করা হয়।

পেটের ব্যথার কারণ অ্যাপেন্ডিসাইটিস, এটা জানার পরেও কিছু কিছু ক্ষেত্রে জরুরি ভিত্তিতে অ্যাপেন্ডিসেক্টোমি অপারেশন করা হয় না। আমরা আগেই জেনেছি অ্যাপেন্ডিক্সের প্রদাহকেই অ্যাপেন্ডিসাইটিস বলে। কোনো জায়গায় কোনো কারণে প্রদাহ সৃষ্টি হলে আমাদের শরীর তার স্বাভাবিক সারানোর প্রক্রিয়া শুরু করে। অ্যাপেন্ডিসাইটিসের সময় এই সারানোর প্রক্রিয়া যদি এতটাই অগ্রসর হয়ে থাকে যে অ্যাপেন্ডিক্স অঞ্চলটি ফুলে গিয়ে অ্যাপেন্ডিক্স 'মাস' তৈরি হয়ে গেছে, আর এই 'মাস' বা গুটুলিটি পেটে হাত দিয়ে ডাক্তাররা বুঝতে পারেন, বা আলট্রাসাউন্ড স্ক্যান বা সিটি স্ক্যান করে দেখা যায়, সেক্ষেত্রে ইমার্জেন্সি অ্যাপেন্ডিসেক্টোমির প্রয়োজন হয় না। অ্যান্টিবায়োটিক দিয়ে চিকিৎসার কয়েক সপ্তাহ পরে অ্যাপেন্ডিসেক্টোমি করা হয়। স্বাস্থ্যের বৃত্তে

ডা. অনিন্দিতা , এমবিবিএস, শ্রমজীবী মানুষদের জন্য তৈরি একটি ক্লিনিকের চিকিৎসক।

Advt.

উৎস মানুষ

বিজ্ঞান, সমাজ ও সংস্কৃতি
বিষয়ক পত্রিকা

প্রাপ্তিস্থান:

কলকাতা: সুমন্ত বিশ্বাস (৯৪৩৩৭৭১৫৭৭/৯১৪৩৭৮৬১৩৪), র‍্যাডিক্যাল ইম্প্রেশন (৬৯৮৮-২২৪১), বই-চিত্র (কফি হাউস তিনতলা), পাতিরাম, ক্রান্তিক, মনীষা (কলেজ স্ট্রিট), অমর কোলে (বি.বা.দী বাগ), দিলীপ মজুমদার (ডেকার্স লেন) সুনীল কর (উল্টোডাঙা), কল্যাণ ঘোষ (রাসবিহারী), রথীন-দা (গোলপার্ক) সৈকত প্রকাশন (আগরতলা)।

যোগাযোগ: ই-মেল-utsamanush1980@gmail.com

অ্যাকিউট কোলেসিস্টাইটিস

পিত্তথলির প্রবল প্রদাহ

ডা. দীপংকর জানা

খাদ্যের সরলীকরণ প্রক্রিয়া খাদ্যগ্রহণের মুখগহ্বর থেকে শুরু হয়। চর্বিজাতীয় খাদ্যের সরলীকরণে যে অঙ্গটি বড়ো ভূমিকা পালন করে তা হল গলব্লাডার বা পিত্তথলি। পিত্তথলি যকৃৎ বা লিভার থেকে নিঃসৃত তরল পদার্থ বাইল (bile) বা 'পিত্ত'-কে সঞ্চিত করে রাখে। প্রয়োজন অনুযায়ী পিত্তথলির সংকোচনের মাধ্যমে কমন বাইল ডাক্ট (common bile duct)-এর সাহায্যে বাইল ক্ষুদ্রান্ত্রে পৌঁছে যায়। এখান থেকেই শুরু হয় চর্বিজাতীয় খাদ্যের সরলীকরণ পদ্ধতি।

বাইল বা 'পিত্ত' কী?

বাইল বা পিত্ত হল গাঢ় সবুজ থেকে বাদামি রঙের একধরনের তরল পদার্থ। পিত্ত যকৃতে তৈরি হয়, পিত্তথলিতে সঞ্চিত হয় এবং ক্ষুদ্রান্ত্রে চর্বিজাতীয় খাদ্য পাচনে মুখ্য ভূমিকা পালন করে। এই তরল পদার্থটি ৯৭% জল, ০.৭% বাইল সল্ট, ০.২% বিলিরুবিন, ০.৫১% কোলেস্টেরল দিয়ে তৈরি হয়। খাদ্য ক্ষুদ্রান্ত্রে পৌঁছোনোর আগের অবস্থা পর্যন্ত পিত্তথলিতেই পিত্ত সঞ্চিত থাকে। কোনো কারণে এর উপাদানগুলির তারতম্য ঘটলে এই পিত্ত শক্ত হয়ে পাথরের মতো হয়ে যায়। একে আমরা গলস্টোন (gall stone) বা পিত্তপাথুরি বলি। সাধারণত পিত্তপাথুরির ফলে আমাদের শরীরে "পিত্তথলির প্রবল প্রদাহ" বা "অ্যাকিউট কোলেসিস্টাইটিস" (Acute Cholecystitis) নামক রোগের সৃষ্টি হয়।

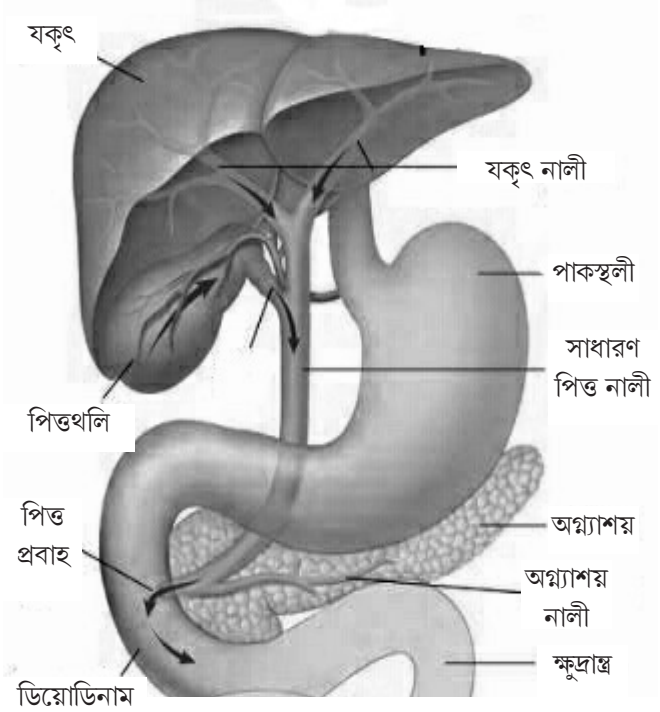

অ্যাকিউট কোলেসিস্টাইটিস হল গলব্লাডার তথা পিত্তথলির প্রদাহ। যখন গলস্টোন আকারে অনেক বড়ো হওয়ার ফলে বাইল নিঃসৃত হওয়ার পথে বাধা সৃষ্টি করতে সক্ষম হয়, তখন এই অবস্থার সৃষ্টি হয়।

অবশ্য অ্যাকিউট কোলেসিস্টাইটিস যে সব সময় গলস্টোন তৈরি হওয়ার জন্য হয় এমনটাও নয়। অনেকসময় বাইলের উপাদানগুলির ঘনত্ব অনেক বেশি হওয়ার জন্য একধরনের পলির মতো থকথকে জিনিস (বিলিয়ারি স্লাজ, billiary sludge) তৈরি করে। তা যদি বাইল নিঃসৃত হওয়ার পথে জমে যায়, তা গলব্লাডারের ভিতরের পর্দায় প্রদাহ তৈরি করে, যেখান থেকে পেটে ব্যথা শুরু হয়। আবার অনেকসময় প্রদাহজনিত কারণে বা নতুন করে ব্যাকটিরিয়ার সংক্রমণ ঘটলেও এইরকম অবস্থার তৈরি হয়।

তবে সমস্ত সমীক্ষা অনুযায়ী শতকরা ৯৫ ভাগ রোগীর গলস্টোনের কারণে অ্যাকিউট কোলেসিস্টাইটিস হয়, আর তাকে বলে 'ক্যালকুলাস কোলেসিস্টাইটিস'। ক্যালকুলাস মানে এখানে কিন্তু নুড়ি বা পাথর, অঙ্কের ক্যালকুলাস নয়। আর শতকরা ৫ ভাগ রোগীর গলস্টোন ছাড়াই অ্যাকিউট কোলেসিস্টাইটিস তৈরি হয়, যাকে 'অ্যাক্যালকুলাস কোলেসিস্টাইটিস' বলে।

গলস্টোন বা পিত্তপাথুরির প্রকারভেদ

প্রধানত তিনধরনের গলস্টোন বা পিত্তপাথুরি হতে পারে:

১. কোলেস্টেরল স্টোন—সাদা রঙের হয়। ২. পিগমেন্ট (pigment) স্টোন—এটি আবার দুই রকমের হয় প্রথমত কালো রঙের যা আমাদের শরীরের অতিরিক্ত রক্তভাঙনের (হিমোলাইটিক অ্যানিমিয়া

বা রক্তভাঙনজনিত রক্তাল্পতা রোগে) কারণে তৈরি হয়, দ্বিতীয়ত বাদামি রঙের যা গলব্লাডারের সংক্রমণের কারণে তৈরি হয়। ৩. মিশ্র (Mixed)—এই ধরনের পাথর সবচেয়ে বেশি দেখা যায়।

গলস্টোন বা পিত্তপাথুরি তৈরির কারণ

প্রকৃত কী কারণের জন্য গলস্টোন তৈরি হয়, তা নিয়ে যথেষ্ট সন্দেহ থাকলেও, কিছু কারণ গলস্টোন তৈরি হওয়ার ঝুঁকিকে বাড়িয়ে দেয়। মোটাসোটা মহিলাদের পিত্তপাথুরির ঝুঁকি বেশি, আর চল্লিশ বছর বয়সের পর, এবং অনেকগুলি বাচ্চাকাচ্চা হয়ে থাকলে, পিত্তপাথুরির ঝুঁকি বাড়ে। এমনকী যাঁদের ক্ষেত্রে খাদ্য শোষণের রোগ থাকে যেমন আলসারেটিভ কোলাইটিস বা ক্রনস ডিজিজ, তাঁদের এই রোগের সম্ভাবনা বেশি। এছাড়া যকৃৎ-এর বিশেষ ধরনের সমস্যায় পিত্তের উপাদানগুলির তারতম্যের কারণেও পিত্তপাথুরি হয়।

অ্যাকিউট কোলেসিস্টাইটিসে কী কী উপসর্গ দেখা যায়?

পেটে ব্যথা দিয়ে উপসর্গ শুরু হয়, তবে এই ব্যথার একটা নির্দিষ্ট চরিত্র আছে, যা পেটের ডানদিকে বুকের পাঁজরের শেষ হাড়ের নীচ থেকে শুরু হয়ে ডানদিকে কাঁধ ও পিঠ পর্যন্ত ছড়িয়ে পড়ে। ব্যথার ওষুধ দিয়ে সহজে ব্যথা কমে না, কয়েক ঘণ্টা পর্যন্ত ব্যথা থাকে। কিছু শারীরিক পরীক্ষার মাধ্যমেও আমরা অ্যাকিউট কোলেসিস্টাইটিস রোগ নির্ধারণ করতে পারি। প্রথমত, যদি রোগীর পিছনে ডানদিকের এগারো, বারো নম্বর পাঁজরের হাড়ে স্পর্শ করি, রোগী অতিরিক্ত ব্যথা অনুভব করে। দ্বিতীয়ত, যেখান থেকে ব্যথা শুরু হয়, শুয়ে থাকা রোগীর সেখানে চাপ দিই এবং রোগীকে নিশ্বাস ছেড়ে তারপর প্রশ্বাস নিতে বলি, রোগী হঠাৎ করে অতিরিক্ত ব্যথা অনুভব করে, আর তার নিশ্বাস ব্যথার চোটে বন্ধ হয়ে যায় (Murphy's sign)। তবে রোগীর পেটে ব্যথা ছাড়াও উচ্চ তাপমাত্রা, বমিভাব বা বমি করা, খাওয়ার ইচ্ছে কমে যাওয়া, চামড়া বা চোখ হলুদ হয়ে যাওয়া, ডানদিকে পেটে ফুলে যাওয়ার মতো অবস্থা—ইত্যাদিও হতে থাকে।

রোগ নির্ধারণের বিভিন্ন পর্যায়

শারীরিক পরীক্ষার মাধ্যমে অ্যাকিউট কোলেসিস্টাইটিস সম্পর্কে ধারণা করতে পারলেও কিছু ল্যাবরেটরি ইনভেস্টিগেশনের মাধ্যমেই সম্পূর্ণ সিদ্ধান্তে পৌঁছোনো উচিত। সবার প্রথমে রক্তের পরীক্ষা ও পেটের আলট্রাসাউন্ড ছবি করা হয়। রক্তের পরীক্ষার মাধ্যমে সংক্রমণ আছে কিনা ধারণা তৈরি করা যায় আর আলট্রাসাউন্ড-এর সাহায্যে গলব্লাডারের পাথর বা প্রদাহ আছে কিনা দেখা হয়।

চিকিৎসা পদ্ধতি

রোগ নির্ধারণ হওয়ার পরে রোগীকে অবশ্যই হাসপাতালে ভর্তি করে চিকিৎসা করা উচিত। প্রাথমিক চিকিৎসা রোগের অবস্থা এবং রোগীর উপসর্গ দেখে করা হয়। যদি রোগীর শারীরিক দিক দিয়ে তেমন বড়ো কোনো উপসর্গ না থাকে, তাহলে রোগীকে নজরদারিতে (Observation-এ) রেখে পরবর্তী চিকিৎসা সম্পর্কে সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়। আর উপসর্গ থাকলে, উপসর্গ অনুযায়ী চিকিৎসা করা হয়, যেমন বমির কারণে যদি শরীর থেকে জলের পরিমাণ কমে যায় তাহলে শিরা দিয়ে দ্রবণ (স্যালাইন), বমি বা পেটে ব্যথার ওষুধ দেওয়া, উচ্চ তাপমাত্রা থাকলে তা কমানোর চেষ্টা করা, সংক্রমণের জন্য অ্যান্টিবায়োটিক দেওয়া হয়। রোগীর অবস্থা ও গলব্লাডারের আলট্রাসাউন্ড ছবি দেখে পরবর্তী চিকিৎসার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়।

তবে পরবর্তীকালে রোগী সম্পূর্ণরূপে উপসর্গমুক্ত হলে অস্ত্রোপচারের মাধ্যমে গলব্লাডার কেটে শরীর থেকে বের করে নেওয়া উচিত। আবার অতিরিক্ত ক্ষতিকর অবস্থা এড়ানোর জন্যও এই অস্ত্রোপচার করা যেতে পারে।

এই অস্ত্রোপচার বিভিন্ন পদ্ধতিতে করা হয়, প্রত্যেকটি পদ্ধতিরই কিছু সুবিধা ও অসুবিধা রয়েছে। এই অস্ত্রোপচারকে আমরা কোলেসিস্টেটেকটমি বলে।

১. ওপেন কোলেসিস্টেটেকটমি

এক্ষেত্রে উপরে ডানদিকে পাঁজরের নীচে বেশ খানিকটা জায়গা কেটে অস্ত্রোপচার করা হয়। যেহেতু অনেকটা কাটা জায়গা দিয়ে অস্ত্রোপচার করা হয়, সেহেতু অস্ত্রোপচারের সময় সার্জনের সুবিধা বেশি হলেও, পরবর্তীকালে ঘা শুকোতে বেশ দেরি হয়, নতুন করে পুরোনো ক্ষতের জায়গায় ব্যাকটিরিয়ার সংক্রমণ হতে পারে।

২. ল্যাপারোস্কোপিক কোলেসিস্টেকটমি

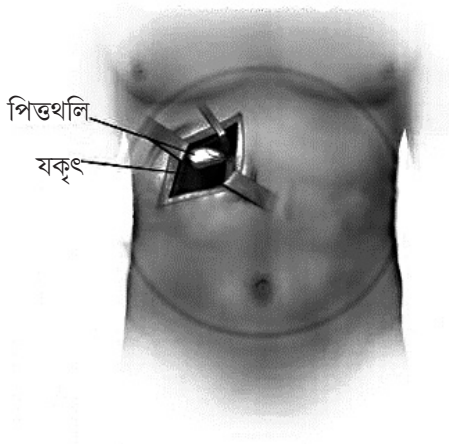

এক্ষেত্রে চারটি ছোটো ছোটো ছিদ্র পেটের মধ্যে তৈরি করে ছিদ্রগুলি দিয়ে বিশেষ ছোটো ক্যামেরা ও অস্ত্রোপচারের যন্ত্রপাতিগুলি প্রবেশ করিয়ে বাইরে থেকে টেলিভিশনের মতন মনিটরে দেখে পিত্তথলি বাদ দেওয়া হয়। ছিদ্রগুলি খুব ছোটো থাকে বলে অস্ত্রোপচারের পরবর্তী

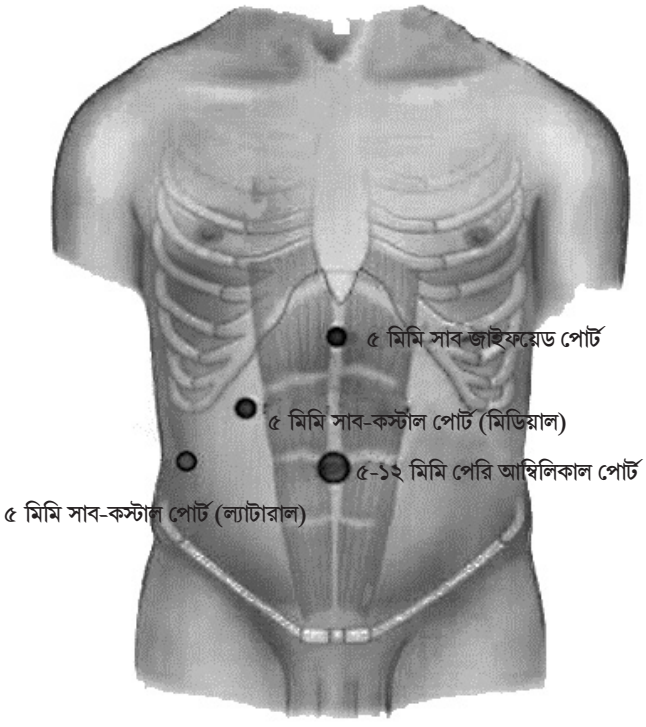

সময়ে খুব অল্প সময়ের মধ্যেই রোগী স্বাভাবিক জীবনযাত্রা শুরু করতে পারেন, ঘা শুকোতেও বেশ কম সময় নেয়। তবে এইভাবে অপারেশন করতে হলে উপযুক্ত ব্যবস্থা দরকার, চিকিৎসককে বিশেষ দক্ষতাসম্পন্ন হতে হয়, আর খরচও বেশি।

৩. সিঙ্গল ইনসেশান ল্যাপারেস্কোপিক সার্জারি (Single Incision Laproscopic Surgery)

এক্ষেত্রে কেবলমাত্র নাভির নীচে একটি ছিদ্রের মাধ্যমে পুরো অস্ত্রোপচারটি করা হয়। এটি অনেক বেশি ব্যয়সাপেক্ষ, এবং রোগী সবচেয়ে তাড়াতাড়ি স্বাভাবিক জীবনযাত্রায় ফিরে আসে।

অ্যাকিউট কোলেসিস্টাইটিস-এর জটিলতা

১. গ্যাংগ্রিনাস কোলেসিস্টাইটিস

অনেক সময় সংক্রমণ থেকে প্রদাহজনিত কারণে, বা রোগ নির্ধারণ করতে দেরি হলে, পিত্তথলির পচন পর্যন্ত ঘটতে পারে। অনেক সময় সংক্রমণ আবার এখান থেকে সারা শরীরে ছড়িয়ে পড়ে আরও অনেক বেশি জটিলতা পর্যন্ত আনতে পারে।

২. পারফোরেটেড গলব্লাডার

অনেক সময় গলব্লাডার ফুটো পর্যন্ত হতে পারে, সেখান থেকে সংক্রমণ পেটের মধ্যে ছড়িয়ে পড়ে পেরিটোনাইটিস নামে এক ধরনের জটিল অবস্থার তৈরি হয়।

কিন্তু মোটের ওপর, অ্যাকিউট কোলেসিস্টাইটিস নিয়ে ভয় পাওয়ার কিছু নেই। আর পিত্তথলি কেটে বাদ দেবার ফলে ক্ষতি হবে, অনেকে এমন আশঙ্কায় ভোগেন। শরীরের কাজে পিত্তথলির ভূমিকা থাকলেও এটা শরীরের খুবই প্রয়োজনীয় অঙ্গ এরকমটা নয়। এটি কেটে বাদ দিলেও আমাদের শরীরে খাদ্য-পাচনের অন্যান্য অঙ্গগুলি এটি ছাড়াই কাজ চালাতে সক্ষম। স্বাস্থ্যের বৃত্তে

ডা. দীপংকর জানা, এমবিবিএস, শ্রমজীবী মানুষের জন্য তৈরি একটি ক্লিনিকের সঙ্গে যুক্ত।

Advt.

অনীক

'অনীক' পত্রিকা বিগত ৫০ বছরের বেশি সময় ধরে চেষ্টা করেছে সমসাময়িক গণতান্ত্রিক ও বিপ্লবী রাজনৈতিক প্রক্রিয়ার অংশ হতে। 'অনীক'-এর বয়োপ্রাপ্তির ইতিহাস তাই সমকালীন গণ-আন্দোনের চলমান দর্পণও বটে। কোনো বিশেষ দল বা গোষ্ঠীর মুখপত্র না হয়েও, সামাজিক দায়বদ্ধতার অঙ্গীকারে অবিচল থেকে সমকালীন রাজনীতি-অর্থনীতি ও সামাজিক প্রক্রিয়াকে ব্যাখ্যা করার প্রচেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে--রাজনৈতিক-অর্থনৈতিক-সামাজিক-সাংস্কৃতিক প্রাসঙ্গিক প্রবন্ধ ছাড়াও গল্প-কবিতা-নাটক ইত্যাদির মাধ্যমে।

বার্ষিক গ্রাহক চাঁদা ১৫০ টাকা (সডাক)

অনীক, প্রযত্নে: পিপলস বুক সোসাইটি। ১০/২ বি রমানাথ মজুমদার স্ট্রিট। কলকাতা-৭০০০০৯

ফোন-৯৪৩২৮৭৭৫৬০/৯৮৩০১৪৩৩৬৫/৯৪৩৩৭২৪৪৬২

অ্যাকিউট প্যাংক্রিয়াটাইটিস

ডা. কুশল সেন

প্যাংক্রিয়াস মানে হল অগ্ন্যাশয়, আর সেখান থেকে কিছু পাচক রস নিঃসরণ হয়ে প্রোটিন ও ফ্যাট পরিপাকে সাহায্য করে। শুধু তাই নয়, এই অগ্ন্যাশয় গ্রন্থির কিছু কোষ থেকে ইনসুলিন বেরোয়, আর ইনসুলিনের অভাবে ডায়াবেটিস মেলিটাস হয়—সেটা আমরা সব্বাই জানি। কিন্তু পেটের মধ্যে থাকা এই গ্রন্থিটা সম্পর্কে আমরা খুব বেশি জানি না। তার প্রদাহজনিত রোগ প্যাংক্রিয়াটাইটিস তত বেশি দেখা যায় না বটে, কিন্তু এটা একটা মারাত্মক প্রাণঘাতী রোগ।

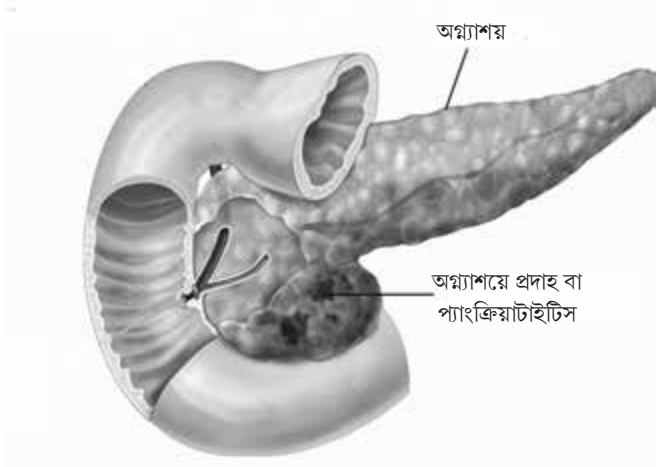

অগ্ন্যাশয় বা প্যাংক্রিয়াস হল আমাদের খাদ্যথলি বা পাকস্থলির পিছনে থাকা একটা ছোট্ট অঙ্গ, যেটা আমাদের খাদ্য পরিপাকে সাহায্য করে। কিন্তু পিত্তথলিতে পাথর থাকলে বা মাত্রাতিরিক্ত মদ্যপানের অভ্যাস থাকলে কখনো কখনো হঠাৎ করে শরীরে অস্বস্তি, জ্বর, প্রচণ্ড পেটে ব্যথা, বমি, পাতলা পায়খানা এইসব উপসর্গ হাজির হয়। খুব অল্প সময়ে অগ্ন্যাশয়ের প্রদাহ হয়ে ফুলে যাওয়ার ফলে এইসব উপসর্গ হতে পারে। এই রোগকে অ্যাকিউট প্যাংক্রিয়াটাইটিস বলে।

এই অসুখে বেশিরভাগ রোগীই কয়েক দিনের মধ্যেই সুস্থ অনুভব করেন এবং পরবর্তীকালেও কোনো সমস্যা থাকে না। কিন্তু কখনো কখনো রোগের তীব্রতা বেশি হয়ে গেলে, রোগের সময় ও পরে রোগীর কপালে থাকে অশেষ ভোগান্তি।

আসুন এই রোগ বা পরিস্থিতি সম্বন্ধে একটু বিশদে জেনে নেওয়া যাক।

কীভাবে সন্দেহ করবেন যে প্যাংক্রিয়াটাইটিস হয়েছে?

হঠাৎ করে প্রচণ্ড অসহ্য পেটে ব্যথা এই অসুখের প্রধান উপসর্গ, এছাড়াও যে উপসর্গ ও লক্ষণগুলো দেখা যায় তার মধ্যে

১. শরীরে অস্বস্তি বোধ, বমি ভাব;

২. বমি, পাতলা পায়খানা;

৩. প্রচণ্ড জ্বর (১০০.৪° ফা.-এর বেশি তাপমাত্রা);

৪. বদহজম;

৫. চামড়া বা চোখ হলুদ হয়ে যাওয়া বা জন্ডিস;

৬. পেট ফুলে যাওয়া ও চাপ দিলে ব্যথা অনুভব হওয়া;

৭. কিছু খাবার সঙ্গে সঙ্গেই শরীরে অস্বস্তি বেড়ে যাওয়া, চিত হয়ে শুলে কষ্ট বেশি হওয়া;

এইগুলো প্যাংক্রিয়াটাইটিসের প্রধান উপসর্গ ও লক্ষণ।

যদি পিত্তথলিতে পাথর থাকে তবে কখনো অত্যাধিক পরিমাণে তেলমশলা-যুক্ত খাবার একসঙ্গে খেয়ে ফেললে তার পরেই প্যাংক্রিয়াটাইটিসের পেটব্যথা শুরু হয়, আর মদ্যপান যদি রোগের কারণ হয়, তবে বেশি মদ্যপানের ৬-১২ ঘণ্টা পরে ব্যথা শুরু হয়। ডাক্তারবাবু ইতিহাস নেওয়ার সময় এই সময়সীমাগুলো রোগের কারণ সম্বন্ধে একটা ধারণা দেয়।

কেন এই পরিস্থিতির সৃষ্টি হয়?

আগেই বলেছি এই অসুখের মূল দু-টি কারণ হল পিত্তথলিতে পাথর আর মাত্রাতিরিক্ত মদ্যপান।

ক. পিত্তথলির পাথর

অনেক সময় পিত্তথলির ভিতর পাথর থাকলে, কখনো হঠাৎ করে

অনেকটা খাবার (বিশেষ করে বেশি তেলমশলা-যুক্ত) খেয়ে ফেললে পিত্তাশয় থেকে পিত্তরসের সঙ্গে কিছু ছোটো পাথর বেরিয়ে এসে অগ্ন্যাশয়ের মূল নালীর মুখ বন্ধ করে দেয়, তখন অ্যাকিউট প্যাংক্রিয়াটাইটিস হতে পারে।

খ. মদ্যপান

'বিপিন বাবুর কারণ সুধা' কীভাবে অগ্ন্যাশয়ে প্রদাহ সৃষ্টি করে তার কারণ সঠিকভাবে জানা নেই। তবে অ্যালকোহল অগ্ন্যাশয়ের ভিতরে কিছু উৎসেচক ক্ষরণ করে, যেটা অগ্ন্যাশয়ের কোষগুলোকেই পরিপাক করে প্রদাহের সৃষ্টি করে বলে কেউ কেউ মনে করেন।

কারণ যাই হোক মদ্যপান ও অগ্ন্যাশয়ের প্রদাহের মধ্যে যে একটা যোগ আছে এটা একদম জলের মতন পরিষ্কার।

ইংরাজিতে বিঞ্জ ড্রিংকিং (বাংলা মানে হল পানোৎসব) বলে একটা কথা আছে যার মানে অল্প সময়ের মধ্যে প্রচুর পরিমাণে মদ্যপান করা—এতেও অ্যাকিউট প্যাংক্রিয়াটাইটিস হওয়ার সম্ভাবনা বেড়ে যায়।

গ. অন্যান্য কারণ

ওপরের দু-টি মূল কারণ ছাড়াও পিত্তথলির অপারেশনের সময় অগ্ন্যাশয়ে আঘাত লাগলে, কোনো কোনো ওষুধের পার্শ্বপ্রতিক্রিয়ায়, মাম্পস বা মিসলস ইত্যাদি ভাইরাসের সংক্রমণে, আর সিস্টিক ফাইব্রোসিস নামক জিনঘটিত রোগ থাকলে অগ্ন্যাশয়ে প্রদাহ হতে পারে।

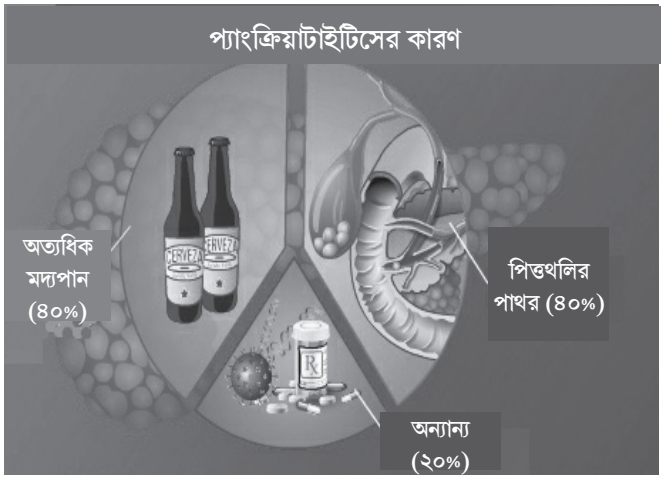

ভয়ানক ('সিভিয়ার') প্যাংক্রিয়াটাইটিস

যদি রোগীর বয়স ৭০ বছরের বেশি হয়, রোগী স্থূলকায় হন, যদি দিনে দুই বা ততোধিক বার মদ জাতীয় খান, পানীয় সেবন করেন, যদি ধূমপায়ী হন, আর যদি পারিবারিক ইতিহাস থেকে থাকে তবে সেইসব রোগীদের প্যাংক্রিয়াটাইটিস অসুখের তীব্রতা বেশি হয় বা ভয়ানক ('সিভিয়ার') প্যাংক্রিয়াটাইটিস হওয়ার সম্ভাবনা থাকে।

রোগ নির্ণয়

সাধারণত প্রচণ্ড পেটে ব্যথা নিয়ে হাসপাতালে ভর্তি হলে সেখানে ডাক্তার প্রথমে রোগের লক্ষণগুলো শুনে পেট টিপে দেখে রোগ সম্বন্ধে ধারণা করেন। তারপর রক্ত পরীক্ষা, ইউএসজি (আলট্রাসাউন্ড) স্ক্যান, সিটি স্ক্যান অথবা এমআরআই স্ক্যান ইত্যাদি পরীক্ষানিরীক্ষার মাধ্যমে নিশ্চিতভাবে রোগ নির্ণয় করা হয়ে থাকে। প্রথম থেকেই রোগটার তীব্রতা কম না বেশি এই ধারণা করা সম্ভব হয় না। রোগীকে হাসপাতালে ভর্তি রেখে নিয়মিত পর্যবেক্ষণে রেখে চিকিৎসা চালাতে হয়, যাতে কোনোরকম বড়ো জটিলতার (যেমন অরগ্যান ফেলিয়োর) সৃষ্টি না হয়।

চিকিৎসা

হাসপাতালে ভর্তি করে অতন্দ্র পর্যবেক্ষণে রাখা হয় যাতে করে কোনো খারাপ ধরনের জটিলতা সৃষ্টি না হয়, আর অক্সিজেন, স্যালাইন বা শিরার ভিতর তরল (intravenous fluid) ইত্যাদি দিয়ে রোগীর উপসর্গ উপশমের চিকিৎসা (supportive treatment) করা হয়।

রোগের তীব্রতা কম থাকলে রোগী একসপ্তাহের মধ্যেই সুস্থ অনুভব করতে শুরু করেন, পরবর্তীকালে জটিলতার সম্ভাবনাও কম থাকে।

পেটে ব্যথা কমানোর জন্য কিছু কিছু ব্যথা কমার ওষুধে আবার ঝিমুনিভাবও আসতে পারে। তাই হাসপাতালে অ্যাকিউট প্যাংক্রিয়াটাইটিস-এর রোগীকে ঝিমোতে দেখলেই ভয় পাবার কারণ নেই।

বেশিরভাগ রোগীকেই কয়েকদিনের মধ্যে হাসপাতাল থেকে ছুটি দেওয়া যায়।

কিন্তু রোগের তীব্রতা বেশি হলে রোগীর শরীরে বিভিন্ন জটিলতার সৃষ্টি হয়। তখন রোগীকে বিশেষ পরিষেবাযুক্ত চিকিৎসা কক্ষে (আইসিইউ বা এইচডিইউ) রেখে চিকিৎসা করতে হবে। আর রোগীর সুস্থ হতে সময়ও অনেক বেশি লাগে। অনেক সময়ই রোগীর জীবনহানির আশঙ্কা থাকে।

ফ্লুইড বা শিরার ভিতর তরল

এই অসুখে শরীরে রক্তে তরলের পরিমাণ কমে যায়। একে আমরা ডিহাইড্রেশন বলি। শিরার মধ্যে বিশেষভাবে তৈরি সুচ ফুটিয়ে তার মধ্যে দিয়ে তরল বা স্যালাইন চালানো হয়।

অক্সিজেন

শরীরে যাতে সঠিক মাত্রায় অক্সিজেন যায় তাই নাকের সামনে সরু নল দিয়ে (nasal canula) বা মাস্ক দিয়ে অক্সিজেন দেওয়া হয়। শরীর সুস্থ

হতে শুরু করলে ক-দিন বাদে অক্সিজেন সাপোর্ট বন্ধ রাখা যেতে পারে।

রোগের তীব্রতা বেশি থাকলে কৃত্রিম শ্বাসযন্ত্রের (mechanical ventilator)-ও প্রয়োজন হতে পারে।

ব্যথা কমার ওষুধ

অসহ্য পেটে ব্যথা কমানোর জন্য ব্যথা কমার ওষুধ ব্যবহার করা হয়। এর মধ্যে কিছু কিছু ওষুধে আবার ঝিমুনিভাবও আসতে পারে। তাই হাসপাতালে অ্যাকিউট প্যাংক্রিয়াটাইটিস-এর রোগীকে ঝিমোতে দেখলেই ভয় পাবার কারণ নেই।

যদি এর সঙ্গে কোনো রকম সংক্রমণ (যেমন প্রস্রাবে বা ফুসুফুসে— যেটা হাসপাতালে দীর্ঘদিন ভর্তি থাকার কারণেই হতে পারে) থেকে থাকে তবে তার জন্য অ্যান্টিবায়োটিক খেতে হবে।

চিকিৎসা চলাকালীন পুষ্টিবিধান

যদি রোগের তীব্রতা কম হয়, পেটে ব্যথা না থাকে তবে মুখেই সাধারণ খাবার খাওয়া যেতে পারে। কিন্তু যদি অবস্থার অবনতি হয়, রোগের তীব্রতা বৃদ্ধি পায়, তবে শক্ত খাবার খাওয়া থেকে কয়েকদিন বিরত থাকতে হবে, কারণ শক্ত খাবার খাওয়ার সময় আমাদের অগ্ন্যাশয়ের উপর চাপ পড়ে। শক্ত খাবার যখন খাওয়া যায় না তখন সব প্রয়োজনীয় খাবারের তরল সুষম দ্রবণ তৈরি করে বিশেষভাবে পরানো নল (রাইলস টিউব) দিয়ে খাওয়ানো হয় (enteral feeding)।

রোগীর পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে এলে রোগের কারণের চিকিৎসা করতে হবে।

পিত্তথলির পাথর

যদি পিত্তথলির পাথরের জন্য অ্যাকিউট প্যাংক্রিয়াটাইটিস হয় তবে মাথায় ক্যামেরা আর বিশেষ যন্ত্র লাগানো লম্বা নল গলার মধ্যে দিয়ে ঢুকিয়ে পিত্তথলি থেকে পাথর বের করে আনা যায়। একে এন্ডোস্কোপিক রেট্রোগ্রেড কোলাঞ্জিও-প্যাংক্রিয়াটিকোগ্রাফি (ERCP) বলে। পাথরশুদ্ধ পিত্তথলি বার করার অপারেশন হাসপাতালে ভর্তি থাকার সময়ই বা দুই সপ্তাহের মধ্যে করা উচিত।

পিত্তথলি বাদ দিলে স্বাস্থ্যের খুব একটা ক্ষতি হয় না, কিন্তু তেলমশলা যুক্ত খাবার হজম করতে সমস্যা হয়।

মদ্যপান

অ্যাকিউট প্যাংক্রিয়াটাইটিস থেকে সেরে ওঠার পর মদ্যপান সম্পূর্ণরূপে বন্ধ রাখতে হবে। যদি মদ্যপান ছাড়তে সমস্যা হয় তবে কোনো মনোরোগ বিশেষজ্ঞ বা বিশেষ নেশা-মুক্তি কেন্দ্রের (de-addiction center) সাহায্য নিতে হবে।

রোগের জটিলতা

রোগের তীব্রতা বেশি থাকলে বেশ কিছু গভীর জটিলতার সৃষ্টি হয়।

অগ্ন্যাশয়ে সিউডোসিস্ট: অ্যাকিউট প্যাংক্রিয়াটাইটিস রোগীদের রোগ সেরে যাওয়ার পরে অগ্ন্যাশয়ের পৃষ্ঠতলে তরল ভর্তি থলি তৈরি হতে পারে। এতে পেটে ব্যথা, বদহজম ইত্যাদি দেখা যেতে পারে। অনেক সময় এটা নিজেই সেরে যায়। কিন্তু এতে জীবাণু সংক্রমণ হয়ে গেলে অপারেশন করতে হয়।

অগ্ন্যাশয়ে সংক্রমণ ও অগ্ন্যাশয়ের পচন: কিছু কিছু ক্ষেত্রে অ্যাকিউট প্যাংক্রিয়াটাইটিসের ফলে অগ্ন্যাশয়ে রক্ত চলাচল বন্ধ হয়ে গিয়ে অগ্ন্যাশয়ের কিছু কোষের মৃত্যু ঘটে, এবং ওই অংশে অগ্ন্যাশয় পচে (necrosis) যেতে থাকে। এর সঙ্গে সঙ্গে কখনো এই ক্ষতিগ্রস্ত অঙ্গে জীবাণু সংক্রমণ হতে পারে। আর এই সংক্রমণ যদি রক্তে ছড়িয়ে যায় তবে সেপসিস হয়ে অর্গান ফেলিয়োর-এর মতো জটিলতার সৃষ্টি হতে পারে এবং রোগীর জীবনহানির আশঙ্কা হতে পারে।

একমাত্র নিয়মমাফিক সুস্থ জীবনযাপনই পারে এই রোগ হওয়া ঠেকিয়ে রাখতে। . . . সমস্ত পেটব্যথাকে . . . উড়িয়ে না দিয়ে শীঘ্র ডাক্তারের পরামর্শ নিন। মদ্যপান থেকে বিরত থাকুন।

ক্রনিক প্যাংক্রিয়াটাইটিস: যদি বারবার অ্যাকিউট প্যাংক্রিয়াটাইটিস হতে থাকে, তাহলে অগ্ন্যাশয়ের কিছু স্থায়ী ক্ষতি হয়ে যায়। এই দীর্ঘকালীন সমস্যা সাধারণ জীবনযাপনে বাধা সৃষ্টি করে। একে ক্রনিক প্যাংক্রিয়াটাইটিস বলে।

অত্যধিক মদ্যপান আর পিত্তথলির পাথরই অ্যাকিউট প্যাংক্রিয়াটাইটিস এর মূল কারণ। তাই একমাত্র নিয়মমাফিক সুস্থ জীবনযাপনই পারে এই রোগ হওয়া ঠেকিয়ে রাখতে। আপনার যদি মদ্যপানের অভ্যাস থেকে থাকে অথবা যদি আপনার অত্যধিক তেল-ঝাল-মশলা যুক্ত খাবার খাওয়ার অভ্যাস থাকে তাহলে সমস্ত পেটব্যথাকে বাঙালির জাতীয় রোগ (গ্যাস-অম্বল) ভেবে উড়িয়ে না দিয়ে শীঘ্র ডাক্তারের পরামর্শ নিন। মদ্যপান থেকে বিরত থাকুন।

তথ্যসূত্র: https://www.nhs.uk/conditions/acute-pancreatitis/

স্বাস্থ্যের বৃত্তে

ডা. কুশল সেন, এমবিবিএস, বর্তমানে একটি সরকারি হাসপাতালে স্নাতকোত্তর পাঠরত।

বাচ্চার সন্ধ্যায় পেটে ব্যথা

ডা. সৌম্যকান্তি পণ্ডা

প্রণববাবু। স্থানীয় প্রাইমারি স্কুলের শিক্ষক। সদ্য কন্যা সন্তানের পিতা হয়েছেন। বাড়িতে একদম হইহই-রইরই-থইথই ব্যাপার। হঠাৎ মাস দুয়েক যেতে না যেতে এ কী অলুক্ষুণে সমস্যা!! কোথাও কিছু নেই . . . বিনা মেঘে বজ্রপাতের মতো কন্যা বিকেল গড়ালেই চিল-চিৎকার জুড়ে দেয়। সে এমন কান্না বাড়ির সবাই মিলে হিমশিম . . . আদরিণী কন্যার কান্না যে কিছুতেই থামে না!! প্রবল উৎকণ্ঠা নিয়ে প্রণববাবু স্ত্রী-কে সাথে নিয়ে ডা. মিত্রর চেম্বারে এলেন . . .

—ডাক্তারবাবু, সন্ধ্যে হলেই মেয়ে কেঁদে বাড়ি কাঁপিয়ে দিচ্ছে। কিছুতেই থামছে না। কী যে করি . . . কিছু করুন স্যার। (তাঁর কপালে বিন্দু বিন্দু ঘাম . . .)

—দাঁড়ান, দাঁড়ান শান্ত হন। এত চিন্তা করবেন না। আগে একটু খুকিকে দেখতে দিন তো দেখি . . . (ডা. মিত্রর গলায় এক অদ্ভুত সম্মোহনী ক্ষমতা আছে। যে কেউ তাঁর আশ্বাস পেলে খানিক ভরসা পায়)। বলে তিনি খুকির কান টেনে, পেট টিপে, বুকে স্টেথোস্কোপ বসিয়ে কীসব পরীক্ষানিরীক্ষা করলেন। তারপর শান্তভাবে স্টেথো পাশে রেখে চেয়ারে টানটান হয়ে বসলেন। তাঁর সহকর্মীদের কাছে এই ভঙ্গিটা খুব পরিচিত। এর মানে (রহস্য গল্পের ডিটেকটিভের মতো) কালপ্রিট ধরা পড়েছে।

—কী বুঝলেন স্যার? আমার মেয়ে ঠিক হয়ে যাবে তো?

—শুনুন, কান্নার অনেক কারণ থাকতে পারে। একটা এই বয়েসের বাচ্চার বাইরের জগতের সাথে যোগাযোগের একমাত্র মাধ্যম-কান্না। অতএব সে খিদে পেলেও কাঁদবে, বিছানায় হিসু করে ফেললেও কাঁদবে আবার পিঁপড়ে কামড়ালেও . . .

—ডাক্তারবাবু, ওসব তো কিছু নয় . . .

—দাঁড়ান, দাঁড়ান। শেষ করিনি। কান্নার অধিকাংশ ক্ষেত্রেই সেরকম ভয়ের কিছু থাকে না। আপনার মেয়ের ক্ষেত্রে খুব সম্ভবত সান্ধ্যকালীন পেট ব্যথা হচ্ছে।

—পেটে ব্যথা? বলেন কি ডাক্তারবাবু!!! আগের বছরই তো আমারও পেটে অসহ্য ব্যথা হচ্ছিল। শেষমেষ দেখা গেল পিত্ত থলিতে পাথর। সেরকমই নাকি!!! অপারেশনটপারেশন . . .

—না, না। এই পেটে ব্যথা সেরকম খারাপ কিছু নয়। সত্যি কথা বলতে এর সঠিক কারণ এখনও আমরা ঠিক বুঝে উঠতে পারিনি। তবে মনে করা হয়: অপরিণত অন্ত্রের অনিয়ন্ত্রিত সংকোচন, অন্ত্রে উপকারী ব্যাকটিরিয়ার ভারসাম্যের অভাব, পাকস্থলীর খাবার সাময়িকভাবে গলায় উঠে আসা . . . এইসব কারণে ব্যথা হয়।

—তাহলে উপায়?

—ম্যাডাম, আপনাকে বলি: সবার আগে মন থেকে দুশ্চিন্তাগুলো সরিয়ে ফেলুন। জানি ক-দিন ধরে আপনি খুব টেনশনে আছেন। একদম ভেবে বসবেন না যে আপনার কিছু ভুলের জন্য বাচ্চা কষ্ট পাচ্ছে। এটা একদম স্বাভাবিক ঘটনা। কারও বেশি, কারও কম হয়। আর যত মানসিক চাপে ভুগবেন, বুকের দুধ তত কমে যাবে।

—আপনি ভরসা দিলেন যখন . . .

—আরও কয়েকটা জিনিস করে দেখতে পারেন, আপনার অভিমানী কন্যা তুষ্ট হয় কিনা . . . দুধ খাওয়ার পর কাঁধের ওপর নিয়ে পিঠ চাপড়ে দিন, পেটে হালকা মালিশ করুন, মৃদু স্বরে একটু গান করুন: ইয়ে, হানি সিং চলবে না (সবাই একসাথে হেসে ওঠেন), হালকা গরম জলে একটু স্নান করিয়ে দিতে পারেন।

—ওষুধপত্র?

—খুব বেশি পরীক্ষিত ওষুধ সেরকম নেই। অনেকক্ষেত্রে সিমেথিকোন বা ডাইসাইক্লোমিন জাতীয় ওষুধ দেওয়া হয় তবে এগুলো নিয়ে আরও গবেষণার প্রয়োজন আছে।

—আর খারাপ কারণগুলো বললেন না?

—হ্যাঁ, অত্যধিক কান্নার খারাপ কারণও কিছু আছে বটে। এই যেমন ধরুন: কানের মধ্যে প্রদাহ, মস্তিষ্ক আবরণীর প্রদাহ, হৃদ্‌যন্ত্রের কিছু রোগ, খিঁচুনি, মূত্রনালীর সংক্রমণ এইসব। তবে আমি যা দেখলাম, তাতে খুব সম্ভবত এইসব কিছু আপনার কন্যার নেই।

—উঃ!! বাঁচালেন!! কতদিনে ঠিক হবে ডাক্তারবাবু?

—মোটামুটি ৫-৬ মাস বয়সের মধ্যে এই সমস্যাগুলো ঠিক হয়ে যায়।

—অনেক ধন্যবাদ আপনাকে . . .

—নমস্কার। স্বাস্থ্যের বৃত্তে

ডা. সৌম্যকান্তি পণ্ডা, এমবিবিএস, ডিসিএইচ, শিশু রোগ বিশেষজ্ঞ।

পার্টি-সংগঠনের বাইরে থাকা দলীয়-আনুগত্যহীন চিকিৎসকদের ম্যানিফেস্টো

এই লেখাটি লিখেছেন **ডা. সমুদ্র সেনগুপ্ত**। এটি *স্বাস্থ্যের বৃত্তে* পত্রিকার সম্পাদকমণ্ডলীর বক্তব্য নয়। পত্রিকায় প্রকাশ করা হল একটি খসড়া হিসেবে, আলোচনার জন্য।

"চিকিৎসকরা ভূত দেখছেন, শারীরিক নিগ্রহের ভূত"

১. ভারত স্বাধীন হওয়ার পর থেকে দেশের নীতি নির্ধারকরা স্বাস্থ্য বিষয়টা নিয়ে চিরকালই বিভ্রান্ত। আন্তর্জাতিক মানবাধিকার সনদে স্বাস্থ্য মৌলিক অধিকার হিসেবে স্বীকৃত হলেও ভারতের সংবিধানে স্বাস্থ্য মৌলিক অধিকার হিসেবে স্বীকৃত হল না। উচ্চারিত হল না সেই প্রত্যয় যে স্বাস্থ্য কোনো পণ্য নয়, দয়ার দানও নয়, এটা অর্জিত অধিকার সদ্য স্বাধীনতাপ্রাপ্ত দেশের নাগরিকদের। বঞ্চনা প্রতারণার সেই শুরু।

২. স্বাস্থ্য পরিষেবা না পণ্য এই দোদুল্যমানতার মধ্যে দেশ পথ চলা শুরু করল। কল্যাণকর রাষ্ট্র মডেল অনুযায়ী স্বাস্থ্যখাতে কিছু বাজেট বরাদ্দ করা হল যা দিয়ে সরকারি স্তরে জনস্বাস্থ্যের কর্মসূচি রূপায়ণ ও স্বাস্থ্য পরিষেবামূলক কাজ যেমন হাসপাতাল ইত্যাদি চালানোর পাশাপাশি মেডিক্যাল, নার্সিং জাতীয় শিক্ষা প্রতিষ্ঠান গড়ে তোলা ও চালানোর কাজ শুরু হয়।

৩. এই বিপুল কর্মকাণ্ডে প্রয়োজনীয় অর্থের তুলনায় বাজেট বরাদ্দ নেহাতই অপ্রতুল সেই গোড়া থেকেই। ফলে শুরু থেকেই প্রয়োজনের তুলনায় স্বাস্থ্যকেন্দ্র, হাসপাতাল, চিকিৎসক ও অচিকিৎসক কর্মচারী, ওষুধপত্র, সাজসরঞ্জামের বিপুল ঘাটতি নিয়ে খুঁড়িয়ে খুঁড়িয়ে চলতে শুরু করে সরকারি স্বাস্থ্য ব্যবস্থা। পরিকাঠামোর ঘাটতি জন্ম দেয় এক অদ্ভুত কর্ম সংস্কৃতির। রোগী শয্যার অভাবে মাটিতে স্থান পায়। সময় মতো টাকা না পাওয়ায় হাসপাতালে বন্ধ হয়ে যায় অক্সিজেন।

৪. নাগরিকরাও ধীরে ধীরে এই ঘাটতিজনিত অসুবিধার সাথে মানিয়ে নিতে শুরু করেন। কেউ নীতি নির্ধারক, শাসকদের দিকে আঙুল তুললেন না। জানতে চাইলেন না কেন আরও অ্যাম্বুলেন্স না কিনে মন্ত্রীদের জন্য বুলেটপ্রুফ গাড়ি বেশি করে কেনা হবে। নাগরিকদের এই মেনে নেওয়ার প্রতিফলন ঘটে তাঁদের প্রিয় রাজনৈতিক দলগুলির মনোভাবেও। দেশের সাধারণ নির্বাচনগুলিতে অংশগ্রহণকারী রাজনৈতিক দলগুলির নির্বাচনী ইস্তেহারগুলিতে চোখ বোলালেই ধরা পড়বে স্বাস্থ্য সংক্রান্ত ইস্যুগুলির অনুপস্থিতি বা অত্যন্ত দায়সারা উপস্থিতি।

৫. এর পাশাপাশি বেসরকারি স্তরে ব্যক্তিগত ক্লিনিক ও ছোটোখাটো নার্সিংহোম গোছের ব্যক্তি মালিকানাধীন হাসপাতাল স্বাধীনতার সময় থেকেই ছিল। সরকারি হাসপাতালে পরিষেবা নিতে অনিচ্ছুক লোকেরাই এর গ্রাহক ছিলেন।

৬. এরপর যত দিন যায় তত বিজ্ঞানের সামগ্রিক উন্নতি ও চিকিৎসাবিজ্ঞানের প্রভূত উন্নতি হতে থাকে। এর সুফল কিছুটা হলেও দেশের সাধারণ নাগরিকরাও পেতে শুরু করেন। ধীরে ধীরে স্বাস্থ্য সূচকগুলি যেমন মাতৃমৃত্যুর হার, শিশুমৃত্যুর হার এসব কমতে থাকে। বাড়তে থাকে নাগরিকদের গড় আয়ু। চিকিৎসাবিজ্ঞানের সাফল্য প্রায় কল্পবিজ্ঞানকেও হার মানাতে শুরু করল। হৃদ্‌যন্ত্র অবধি প্রতিস্থাপন শুরু হল। এযাবৎ কাল দুরারোগ্য হিসেবে চিহ্নিত ব্যাধিগ্রস্ত রুগীরাও মৃত্যুমুখ থেকে ফিরে আসতে লাগলেন একের পর এক।

৭. পাল্লা দিয়ে বাড়তে থাকে আধুনিক চিকিৎসাবিদ্যায় শিক্ষিত চিকিৎসকদের প্রতি মানুষের আস্থা, সম্ভ্রম ও প্রত্যাশা। মানুষ তখন ডাক্তারকে বসিয়ে দিলেন এক জাদুকর দেবতার আসনে।

৮. সঙ্গে দেশ এগিয়ে চলল এক জনসংখ্যা বিস্ফোরণের দিকে। প্রচুর মানুষ মানে প্রচুর রোগীর সাথে তাল মিলিয়ে বাড়ল না পরিকাঠামো। নাগরিক পিছু চিকিৎসকের অনুপাত ভালো হওয়ার বদলে আরও খারাপ হতে লাগল।

৯. প্রযুক্তি-নির্ভর এই উন্নতি ভারত ও পৃথিবীর অন্যান্য তৃতীয় বিশ্বের দেশগুলি আমদানি করতে বাধ্য হয়। কিন্তু বাজেট অপ্রতুলতার কারণে গুটিকতক বাছাই করা সরকারি হাসপাতালে ওইগুলি উপলব্ধ করা সম্ভব হয়। যে হারে বিজ্ঞান প্রযুক্তির অন্য শাখাগুলিতে গবেষণা ইত্যাদির মাধ্যমে দেশ ধীরে হলেও স্বনির্ভরতার দিকে এগিয়ে যেতে থাকল, সেই হারে চিকিৎসা প্রযুক্তি বা ওষুধ আবিষ্কারের ধারা এগোল না।

১০. অন্যদিকে দেশের মধ্যে ধীরে ধীরে ধনাঢ্য শ্রেণির পাশাপাশি উচ্চ মধ্যবিত্ত শ্রেণির লোকের সংখ্যা বাড়তে থাকে যারা ওই আধুনিক প্রযুক্তি নির্ভর চিকিৎসা পরিষেবার সুফল নিতে উদ্‌গ্রীব এবং সচ্ছল।

এই নতুন তৈরি হওয়া চাহিদার জোগান দিতে এগিয়ে আসল কর্পোরেট পুঁজি। ব্যক্তি মালিকানাধীন বেসরকারি হাসপাতালের পাশাপাশি মাথা চাড়া দিতে শুরু করল কর্পোরেট হাসপাতাল। চিকিৎসক মালিকের ভূমিকা থেকে চলে গেলেন কর্মচারীর ভূমিকায়। এমনকী তাঁকে হোয়াইট কলার মজুরও বলা চলে।

১১. বিপুল পরিমাণ পুঁজি বিনিয়োগকারী, ব্যক্তিমালিক বা প্রতিষ্ঠানের স্বভাবতই উদ্দেশ্য হয়ে দাঁড়াল মুনাফা অর্জন এবং দ্রুত মুনাফা অর্জন। সেই অভীষ্ট পূরণের জন্য এরা বহুক্ষেত্রেই নানারকম অনৈতিক কাজকর্ম শুরু করল। এর ফল ভুগতে শুরু করলেন পরিষেবা গ্রহণকারীরা। ততদিনে পয়সা দিয়ে স্বাস্থ্য কেনার এই স্রোতে উচ্চবিত্ত বা উচ্চমধ্যবিত্তরা ছাড়াও নিম্নমধ্যবিত্তরাও ঘটিবাটি বেচেও শামিল হতে শুরু করলেন।

১২. নির্বাচকমণ্ডলীর এই বিপুল অংশের ক্ষোভকে কোনো দেশের রাষ্ট্রশক্তিই অবহেলা করতে পারে না। সরকারি স্বাস্থ্য ব্যবস্থার পরিকাঠামোর উন্নতির জন্য বাজেট বরাদ্দ বাড়ানোর দিকে নজর না দিয়ে সরকার বেছে নিল সহজ রাস্তা। সদ্য তৈরি হওয়া ক্রেতা-সুরক্ষা আইনের আওতায় নিয়ে আসা হল স্বাস্থ্য পরিষেবাকে। সরকার অলিখিতভাবে মেনে নিল যে স্বাস্থ্য আর অধিকার নয়, রাষ্ট্রের দায়িত্ব নয় তার নাগরিককে বিনামূল্যে স্বাস্থ্য পরিষেবা দেওয়া। স্বাস্থ্য আসলে পণ্য। পরিষেবাদানকারী থেকে চিকিৎসক পরিণত হলেন বিক্রেতায়।

১৩. সাধারণ মানুষ তথা ক্রেতা বুঝলেন না যে অন্য পণ্যের বিক্রেতার থেকে পরামর্শদানকারী চিকিৎসক যিনি নিজেই একজন সরকারি বা বেসরকারি কর্মচারী, তাঁর তফাত কোথায়। সুকৌশলে গুলিয়ে দেওয়া হল চিকিৎসকের সামাজিক অবস্থান।

১৪. নব্বই দশকে ভারতে শুরু হল নতুন মনোমোহিনী অর্থনীতি। পুঁজিপতিরা সারা পৃথিবীর ম্যানুফ্যাকচারিং শিল্পে মন্দা বাজারের জন্য দেশি বিদেশি হন্যে হয়ে খুঁজছিল পুঁজি বিনিয়োগের নতুন বাজার। তারা লুফে নিল এই আর্থিক সংস্কার। তাদের হয়ে আসরে নামা বিশ্বব্যাঙ্ক ও আন্তর্জাতিক মুদ্রা ভাণ্ডারের নির্দেশ মেনে বিভিন্ন দেশের সরকারের মতো আমাদের দেশের সরকারও ইচ্ছাকৃত ঔদাসীন্য দেখাতে শুরু করল বিভিন্ন পরিষেবামূলক কাজে ব্যয়বরাদ্দে যেমন পরিবহণ, স্বাস্থ্য, শিক্ষা ইত্যাদি।

১৫. এই সংকোচনটাই চাইছিল কর্পোরেট পুঁজি। তারা বুঝে গিয়েছিল যে মানুষ চড়া দামে, যেকোনো দামে এমনকী সর্বস্বান্ত হয়েও যেটা কিনতে রাজি সেটা হল স্বাস্থ্য। কর্পোরেট হাসপাতাল গজিয়ে উঠল ব্যাঙের ছাতার মতো চারদিকে। তার খদ্দেরের টাকার জোগান দিতে পিছু পিছু আসল স্বাস্থ্য বিমা বেচার দল। মধ্যবিত্ত স্বাস্থ্য নিরাপত্তার খাতিরে ওই বিমা কোম্পানির খদ্দের হতে লাইন লাগিয়ে দিল।

১৬. ভোগ্যপণ্যের জয় জয়কার শুরু হল চারদিকে। স্বাধীনতার পরবর্তী সময়কার কৃচ্ছ্রসাধনের মানসিকতার শেষ চিহ্নটুকু মুছে ফেলতে শুরু করল দেশবাসী। ভোগবাদভিত্তিক সমাজে বড়ো হয়ে ওঠা নতুন প্রজন্ম জন্ম দিল নতুন মূল্যবোধের। স্বাস্থ্য, শিক্ষা সর্বত্র ছড়িয়ে গেল এই বিষবৃক্ষের ফল। টাকা দিয়ে সব কিছু কেনা যায় এই বিশ্বাস আরও গভীরতর হল যখন মানুষ দেখলেন মেধার বদলে অর্থের বিনিময়ে মেডিক্যাল কলেজে ভর্তি হয়ে ডাক্তার হওয়া যায় যেটা দু-দশক আগেও অকল্পনীয় ছিল।

১৭. তাই এই সমাজ নতুন করে ভাবতে বসল, নতুন করে মূল্যায়ন করল চিকিৎসকের। তাকে দেবতার আসন থেকে টেনে নামানো হল আবেগহীন, নিছক পেশাদারের আসনে। পরিবার, পরিজন, নিয়োগকর্তা, সমাজের কাছে সে পরিণত হল নিছক টাকা কামানোর যন্ত্রে।

১৮. অনিয়ন্ত্রিত পুঁজির এই বাজার, সময়ে সময়ে সোনার ডিম পাড়া হাঁসের একদিনেই পেট কেটে সমস্ত ডিম লাভের আশায় জড়িয়ে পড়ল নানা বেপরোয়া অনৈতিক কাজে। অপ্রয়োজনীয় হাসপাতাল ভর্তি থেকে শুরু করে অপ্রয়োজনীয় অস্ত্রোপচার অবধি চালু হল। মালিকদের মুনাফা কামানোর প্রধান সহায় হয়ে উঠল একশ্রেণির বিবেকহীন চিকিৎসক কর্মচারী।

১৯. একশ্রেণির চিকিৎসক চোখ বন্ধ করে দু-হাত তুলে চিকিৎসা ব্যবস্থার এই বাজারিকরণকে স্বাগত জানাল। তারা স্বেচ্ছায় জড়িয়ে পড়ল নানা কাজে যেমন হাসপাতাল মালিকানায় পুঁজি বিনিয়োগ, শেয়ার কেনা, গোলমেলে ক্লিনিক্যাল ট্রায়ালে অংশ নেওয়া, এবং অনৈতিক কর্মকাণ্ড নিয়ে ম্যানেজমেন্টকে মদত দেওয়া ইত্যাদি।

২০. চিকিৎসকদের একটা অংশ বরাবরই অন্য অংশের এইসব কাজের বিরোধিতা করে এসেছেন নানাভাবে। কিন্তু চিকিৎসকদের পেশাদার সংগঠনগুলি এই ধরনের দু-নম্বরি কাজকর্ম, যেমন কিকব্যাক নেওয়া, অপ্রয়োজনীয়, অযৌক্তিক ওষুধ লেখা, অস্ত্রোপচার করা, ওষুধ কোম্পানির টাকায় প্রমোদ ভ্রমণ ইত্যাদির বিরুদ্ধে বেশিরভাগ ডাক্তারকে একজোট করে বৃহৎ আকারের বিরোধিতার মঞ্চ তৈরি করতে পারেনি। সাধারণ অচিকিৎসকসহ নাগরিকদের শামিল করে বৃহত্তর মঞ্চ তো অনেক দূরের কথা। সংগঠন ও সরকার যৌথভাবে উদ্যোগ নিয়ে অনৈতিক কাজে রাশ টানার জন্য পেশাদারদের জন্য প্রযোজ্য আইন-কানুনে নীতি নৈতিকতা নিয়ে গালভরা কতগুলি বাছা বাছা শব্দ যুক্ত করে সংশোধনী আনল, সাধারণ মানুষের কাছে যার ব্যাবহারিক মূল্য প্রায় শূন্য।

২১. যেকোনো পেশাদার পরিষেবাদানকারীর পরামর্শের সামনে সিদ্ধান্ত নিতে অপেশাদার গ্রাহক অসহায় বোধ করে। প্লাম্বারের দেওয়া এস্টিমেট-এর সামনে, কম্পিউটার ইঞ্জিনিয়ার বা ইলেকট্রিশিয়ান-এর এস্টিমেট-এর সামনে, ইংরেজি সাহিত্যের অধ্যাপক অসহায় বোধ

করেন তাঁরা নিজ নিজ ক্ষেত্রে যতই খ্যাতনামা হন না কেন। সেবক-গ্রহীতার এই সম্পর্কের সূত্র ধরে অসহায়তার বোধ মানুষ সবচেয়ে বেশি বোধ করেন চিকিৎসকের পরামর্শের সামনে। চিকিৎসাবিজ্ঞানের ন্যূনতম ধ্যানধারণা না থাকার জন্য রোগীর বাড়ির লোক ডাক্তারের সিদ্ধান্তের কাছে অনিচ্ছা সত্ত্বেও আত্মসমর্পণ করতে বাধ্য হন। বর্তমান পরিষেবা=পণ্য, এই মূল্যবোধ ভিত্তিক সমাজে অত্যন্ত সহজবোধ্য কারণেই রোগীর বাড়ির লোক ওই আত্মসমর্পণটাকে মন থেকে মেনে নিতে পারলেন না। সন্দেহ অবিশ্বাসের ওই বাতাবরণে আগুন জ্বালানোর কাজ করল আত্মীয়স্বজন ও গণমাধ্যমের বিভিন্ন গল্প কাহিনি।

২২. বর্তমান দশকে প্রযুক্তির দৌলতে তথ্য চলে এল আক্ষরিক অর্থে হাতের মুঠোয়, অন্তত একদল মানুষের জন্য। আট বছর ধরে অমানুষিক পরিশ্রম করে তৈরি হওয়া একজন চিকিৎসকের জ্ঞান বুদ্ধির সাথে পাল্লা দিতে লাগল আট মিনিটের অন্তর্জালের দুনিয়ায় ঘোরাঘুরি। মিনিটে মিনিটে জন্ম নিতে লাগল ওইসব আট মিনিটের বিশেষজ্ঞদের মতামত। চিকিৎসকদের শ্রদ্ধার আসনটা আরেকবার টলে গেল ওইসব অল্পবিদ্যা ভয়ংকরীদের কাছে। পাড়ার চায়ের দোকান থেকে শুরু করে ফেসবুকের দেওয়াল, কলতলার গল্প আড্ডা থেকে বহুল প্রচারিত সংবাদপত্রের পাতা, সর্বত্র সমালোচনার ঝড় বয়ে যেতে লাগল। চিকিৎসায় গাফিলতির নিত্য নতুন দিক আবিষ্কার হতে লাগল। রাষ্ট্রের অঙ্গুলি হেলনে বোধবুদ্ধিহীন পুলিশ নেমে পড়ল চিকিৎসকদের গ্রেপ্তারে অনিচ্ছাকৃত মৃত্যুর অভিযোগের সেই আইনি ধারাকে কাজে লাগিয়ে যা দিয়ে বেপরোয়া লরিচালককে গ্রেপ্তার করা হয়।

২৩. জন্ম নিল মানুষের মধ্যে নতুন করে ক্ষোভ-বিক্ষোভ। পাছে তিরটা তার দিকে ঘুরে যায় এই ভয়ে সরকার আবার সেই কৌশল নিল। জন্ম দিল নতুন কর্পোরেট হাসপাতাল নিয়ন্ত্রণ আইনের। কিন্তু ভুলেও বাজেট বরাদ্দ বাড়ানোর কোনো উদ্যোগ নিল না। মানুষ চাইলেন স্বাস্থ্য নিরাপত্তা আর তাঁর হাতে ধরিয়ে দেওয়া হল শুকনো আইনের একটুকরো কাগজ।

২৪. যখন মানুষ মরিয়া হয়ে, সর্বস্বান্ত হয়ে কিছু পাওয়ার চেষ্টা করেন এবং সেই কিছুটা হল তাঁর প্রিয়জনের প্রাণ তখন স্বভাবতই তাঁর মনে এক আকাশচুম্বী প্রত্যাশা। সেই প্রত্যাশাপূরণে ব্যর্থ হলে হতাশার পাশাপাশি তাঁর মনে জন্ম নেয় অক্ষমের ক্রোধ। সেই ক্রোধ বা ক্ষোভ যদি সঠিক পথে পরিচালিত না করা যায় তাহলে সেটা বহুক্ষেত্রেই ধ্বংসাত্মক দিকে চলে যায়।

২৫. অন্যদিকে সরকারি স্বাস্থ্যক্ষেত্রে মানুষের অভিজ্ঞতা তিক্ত থেকে তিক্ততর হতে লাগল। পরিকাঠামোর ঘাটতির অবশ্যম্ভাবী ফলাফল স্বরূপ করদাতা সাধারণ নাগরিক পেলেন, দম বন্ধ পরিবেশে ঘণ্টার পর ঘণ্টা লাইনে দাঁড়িয়ে পাঁচ মিনিটের পরামর্শ, জীবনদায়ী পরীক্ষার তারিখ পরের দিনের বদলে তিন মাস বাদে পাওয়া, জরুরি আপৎকালীন ভর্তির জন্য, একটি হাসপাতাল শয্যার জন্য এদিক থেকে ওদিক উদ্‌ভ্রান্তের মতো ছোটাছুটি, হয়রানির অভিজ্ঞতা।

২৬. একদিকে প্রতারণার শিকারের কাহিনি তো অন্যদিকে হয়রানির। এই ক্ষুব্ধ মানুষ প্রতিবাদের জন্য বেছে নিতে শুরু করলেন হাতের কাছে সহজলভ্য লক্ষ্যবস্তু—পরিষেবা দিতে দিতে বিধ্বস্ত, ক্লান্ত চিকিৎসক, স্বাস্থ্যকর্মীদের। নেমে আসতে শুরু করল একের পর এক ছোটো বড়ো শারীরিক নিগ্রহের ঘটনা। প্রতিবাদ করে, প্রতিশোধ নিয়ে ডাক্তারের হাত পা ভেঙে, তাঁকে বিষ্ঠা মাখিয়ে, নার্সের গালে চড় কষিয়ে, তাঁর শ্লীলতাহানি করে আপাত-তৃপ্ত জনতা বাড়ি ফিরে গেলেন। ভুলেও ভাবলেন না, সবই হল, খালি প্রতিকারটুকু হল না।

২৭. এই অলীক কুনাট্যে রাষ্ট্রযন্ত্র মুখ্যত নীরব দর্শকের ভূমিকা নিল। কারণ তার অপদার্থতা, তার নীতিপঙ্গুত্ব এতে ঢাকা পড়ে গেল। রাষ্ট্রযন্ত্র তখনই নীরব থেকে সরব হল যখন সে মানবদরদী সাজতে গিয়ে সুকৌশলে নিজের অপদার্থতার দায় চাপিয়ে দিল চিকিৎসকের একাংশের অনৈতিক আচরণ আর সীমাহীন লোভের দিকে। রাষ্ট্রযন্ত্রের এই কৌশল আরও বেশি করে উসকে দিল জনমানুষের অসহিষ্ণুতা। চিকিৎসক দেবতার আসন থেকে আগেই স্থানচ্যুত হয়েছিলেন। এবার তাঁকে দেওয়া হল অসুরের তকমা। গণশত্রু।

২৮. চিকিৎসক নিগ্রহের ঘটনা আর সাম্প্রতিককালে বিচ্ছিন্ন দু-একটা ঘটনায় সীমাবদ্ধ নেই। দৈনিক সংবাদপত্রের পাতায় এ-জাতীয় ঘটনা না থাকাটাই ব্যতিক্রম হয়ে উঠছে। সাধারণ নাগরিকদের গা-সহা হয়ে যাচ্ছে। ভোঁতা হয়ে যাচ্ছে তাঁদের অনুভূতিগুলো। তাঁরা আর চিকিৎসক নিগ্রহের ঘটনায় উদ্‌বেলিত, উদ্‌বিগ্ন হন না। গ্রামের প্রান্তিক প্রাথমিক স্বাস্থ্যকেন্দ্রের নবীন চিকিৎসকের গায়ে বিষ্ঠা লেপন থেকে শুরু করে ঝাঁ চকচকে কর্পোরেট হাসপাতালের প্রবীণ চিকিৎসকের রক্তাক্ত মুখ সবই সয়ে যেতে শুরু করেছে বিবেকবান সহ-নাগরিকদের।

২৯. এর বিষময় ফল ফলতে শুরু করেছে। বেশিরভাগ চিকিৎসকই আর কোনো ঝুঁকি নিতে চাইছেন না। স্রেফ পিঠ বাঁচানোর তাগিদে বিশেষজ্ঞদের কাছে রেফার-এর সংখ্যা বাড়ছে, বাড়ছে যেকোনো অসুখে মাথায় চুল থেকে পায়ের নখ অবধি পরীক্ষা করার জন্য টেস্ট-এর সংখ্যা। সরকারি চাকরি থেকে আনুষ্ঠানিক পদত্যাগ বা এমনি বসে যাওয়া চিকিৎসকের সংখ্যা বাড়ছে। নবীনরা ভিন দেশে পাড়ি জমানোর আপ্রাণ চেষ্টা করছেন। এসব দেখে শুনে মেধাবী ছাত্রছাত্রীরা ডাক্তারি পড়াশোনা বেছে নেবেন কিনা তাই ভাবতে শুরু করেছেন। এভাবে চলতে থাকলে চিকিৎসক নাগরিক অনুপাত আরও খারাপ হবে। সহ নাগরিকদের ভাববার সময় এসেছে রুগী ছাড়া যেমন ডাক্তারি পেশাটা বাঁচবে না তেমনি ডাক্তার ছাড়াও রুগীরা বাঁচবে না। তাই প্রয়োজন হয়ে পড়েছে এই দুর্বিষহ অবস্থা কাটিয়ে ওঠার জন্য কিছু সুচিন্তিত পদক্ষেপ নেবার।

৩০. গণ-অসহিষ্ণুতার এই বিশেষ মনস্তাত্ত্বিক পটভূমিকায় প্রকৃত পেশাদার হিসেবে চিকিৎসকদের দায়িত্ব থেকে যায় নিজের ইন্টেলেকচুয়াল সুপিরিয়রিটি-র উচ্চ আসন থেকে নেমে এসে সহজ সরল ভাষায় রোগীর বাড়ির লোককে তাঁর মতো বুঝিয়ে বলা যাতে তাঁরা গ্রাহক হিসেবে সঠিক সিদ্ধান্ত নিতে পারেন। সরকারি হাসপাতালের হাস্যকর রুগী-চিকিৎসক অনুপাতের প্রেক্ষিতে এই আশা কবে সফল হবে কেউ জানে না।

৩১. রাষ্ট্রের এই পাহাড় প্রমাণ ব্যর্থতার কাহিনি সহ-নাগরিকদের কাছে তুলে ধরলেই দায়িত্ব শেষ হয়ে যায় না। অথবা সতীর্থ চিকিৎসকদের এক অংশের হিরণ্ময় নীরবতার দিকে আঙুল তুলে ধরলেও দায়িত্ব শেষ হয় না। এই অসহনীয় পরিস্থিতি থেকে বেরিয়ে আসার পথনির্দেশ দিতে হবে। রাষ্ট্র যেমন বাধ্য করছে তার বাইরে গিয়ে স্বাধীনভাবে চিন্তাভাবনা করতে হবে, বাজার অর্থনীতির প্রবক্তাদের তৈরি করা মাকড়সার জাল চোখের সামনে থেকে সরিয়ে তাকাতে হবে চারপাশে। সঠিক রণনীতি ও রণকৌশল তৈরি করতে হবে।

৩২. হাসপাতালগুলির পরিচালকদের দায়িত্ব থেকে যায় রুগী বা তাঁর লোকজনদের ওই চিকিৎসার সম্ভাব্য বিজ্ঞানভিত্তিক ফলাফল সম্পর্কে অবহিত করা, মুনাফার দিকে তাকিয়ে অবাস্তব প্রতিশ্রুতি দেওয়া থেকে বিরত থাকা, অপ্রয়োজনীয় ওষুধপত্র বা পরীক্ষানিরীক্ষা লেখা থেকে একশ্রেণির চিকিৎসককে বিরত করা এবং দ্রুত ও বিশ্বাসযোগ্য একটি ক্ষোভ-প্রশমন ব্যবস্থা গড়ে তোলা।

৩৩. রাষ্ট্রযন্ত্রের আশু দায়িত্ব মূলত তিনটি ক্ষেত্রে। প্রশাসনের সর্বোচ্চ মহল থেকে হাসপাতালে নিগ্রহ সহ সকল প্রকার বিশৃঙ্খলার ঘটনাকে খোলাখুলি নিন্দা করা, দোষীদের খুঁজে বার করে দ্রুত শাস্তি বিধান করা এবং হাসপাতালগুলিতে নিরাপত্তা ব্যবস্থা জোরদার করা ইত্যাদি।

৩৪. এর পাশপাশি অন্তর্বর্তীকালীন ব্যবস্হা হিসেবে রুগীদের পক্ষ থেকে দায়ের করা অভিযোগগুলির দ্রুত নিষ্পত্তির ব্যবস্থা করা, একটি সবল জনসংযোগ ব্যবস্থাপনা গড়ে তোলা, বিজ্ঞানসম্মত একটি নজরদারি ব্যবস্থাপনা গড়ে তোলা ইত্যাদি।

৩৫. দীর্ঘমেয়াদি ব্যবস্থা হিসেবে স্বাস্থ্যখাতে ব্যয় সংকোচনের নীতি থেকে সরে এসে স্বাস্থ্যখাতে ব্যয়বরাদ্দ বৃদ্ধি করা, পরিকাঠামোর উন্নতি করা।

৩৬. একজন চিকিৎসক দেবতা বা দানব কিছুই নন, বরং আর পাঁচজনের মতোই একজন সাধারণ মানুষ যাঁর খালি একটি শাস্ত্রে বিশেষ শিক্ষণ-প্রশিক্ষণ আছে। এই সত্যিটা সহ নাগরিকরা যত তাড়াতাড়ি বোঝেন ততই মঙ্গল। তাঁরা সবাই অর্থলোলুপ হলে স্বাস্থ্য ব্যবস্থাটাই যে এদ্দিনে ভেঙে পড়ত এটা বোঝা ও বোঝানো প্রয়োজন।

৩৭. কোনো কাজটাই বলা যত সহজ করা তত সহজ নয়। রাজনৈতিক দলগুলো এইসব কর্মসূচি কবে নেবে সেই ভরসায় বসে থেকে লাভ নেই। যেকোনো রাজনৈতিক নেতা বা সরকারি আমলার থেকে সমস্যার গভীরে গিয়ে তার সমাধান খোঁজার মতো বুদ্ধি বিবেচনা বোধ ও অভিজ্ঞতা একমাত্র চিকিৎসকদেরই আছে।

৩৮. কেবল নিজেকে বা সহকর্মীকে দৈনন্দিন নিগ্রহ লাঞ্ছনার ভয়, গ্রেপ্তার হয়ে যাবার ভয় থেকে মুক্ত করার তাগিদে শুধু নয়, তাঁর স্ত্রী পুত্র কন্যা পরিবারকে মানসিক উদ্‌বেগ থেকে মুক্ত করার তাগিদ শুধু নয়, তাঁর অসংখ্য প্রিয়জন, আত্মীয়স্বজন, বন্ধুবান্ধব সহ সমগ্র সমাজকে এই অসহনীয় অবস্থা থেকে রেহাই দেবার তাগিদে ছোটো থেকে বড়ো, সরকারি থেকে বেসরকারি, নবীন থেকে প্রবীণ, দলমত নির্বিশেষে চিকিৎসকদের এগিয়ে আসতে হবে।

৩৯. আতঙ্কিত চিকিৎসকরা সত্যিই নিগ্রহের ভূত দেখতে শুরু করেছেন। কাজের দিনটি শুরু করার সময় কেউ জানেন না দিনটা কেমন কাটবে। সবাই ভাবছেন আজ আমার নিগৃহীত হবার পালা নয়তো। এই ভাবনা থেকে চিকিৎসকরা জোট বাঁধছেন। সরকারের দরজায়, আদালতের দরজায় যাচ্ছেন আবেদন-নিবেদন নিয়ে। রাস্তায় নামছেন মিছিল করতে। দাবি তাঁদের সুরক্ষা চাই, নিরাপত্তা চাই, নিগ্রহের আতঙ্ক থেকে মুক্তি চাই।

৪০. যে সভ্য সমাজ চিকিৎসককে বাধ্য করে নিরাপত্তার দাবিতে রাস্তায় নামতে সেই সমাজের আত্মনিরীক্ষণ প্রয়োজন। এবং আশু প্রয়োজন। সাধারণ শুভবুদ্ধিসম্পন্ন মানুষকে এই চিকিৎসক নিগ্রহের প্রতিবাদ করতে হবে দ্বিধাহীন ভাষায়। মনে রাখতে হবে কোনো কারণ, কোনো যুক্তি দিয়ে চিকিৎসাকর্মী নিগ্রহের ন্যায্যতা প্রতিপাদন করা যায় না।

৪১. তাই সাধারণ মানুষকে সঙ্গে নিয়ে চিকিৎসকদের ও অন্যান্য স্বাস্থ্যকর্মীদের সংগঠনগুলিকেই দলমত নির্বিশেষে এই কাজে এগিয়ে আসতে হবে। মানুষ তৈরি করবে চিকিৎসকদের সুরক্ষা বলয়।

৪২. "স্বাস্থ্য কোনো পণ্য নয়, এটা মৌলিক অধিকার"—এই স্লোগান চিকিৎসকদের নেতৃত্বে সকল স্তরের স্বাস্থ্যকর্মীদেরই তুলতে হবে। সাধারণ মানুষকে এই স্লোগানে গলা মেলাতে হবে তাঁর স্বাস্থ্য রক্ষার স্বার্থে। তবেই রাষ্ট্রকে বাধ্য করা যাবে চিকিৎসককে দৈহিক নিরাপত্তা ও সাধারণ মানুষকে স্বাস্থ্য নিরাপত্তা দেওয়ার বিষয়ে তার দায়িত্ব পালনে।

৪৩. চিকিৎসক দেবতা নন, দানব নন, চিরন্তন আশাবাদী এক মানব যে সাহস করে রোগ ও মৃত্যুর সাথে অসম লড়াই-এ অভ্যস্ত। পালিয়ে যাওয়া ধাতে নেই, সে আক্রমণের মুখোমুখি হোক কিংবা অসুখের। এই লড়াইতে ওই আশা আর সাহসটুকুই তো সম্বল।

"ভয় করার কিছু আর নেই, জয় করার জন্য পড়ে আছে সব মানুষের মন।" স্বাস্থ্যের বৃত্তে

ডা. সমুদ্র সেনগুপ্ত, এমবিবিএস, ডি পি এইচ, স্বাস্থ্য প্রশাসক।

নেপথ্য নায়ক

ডা. সব্যসাচী সেনগুপ্ত

বেজায় গরম। আউটডোরে বসে বসে coolcool-ইয়ে ঘামছি আর রুগী দেখছি। হঠাৎ শুনতে পেলাম—পুঁ পাঁ। কী ব্যাপার? খামোখা হঠাৎ পোঁপাঁয় কে? হাতের রুগী কয়েকজনকে ছেড়ে দিয়ে শব্দানুসন্ধান করতে বেরোলাম।

আওয়াজটা আসছে ল্যাব-এর থেকে। ল্যাব মানে ল্যাবরেটারি। কফ পরীক্ষা করা হয় এইখানে। সরেজমিনে খতিয়ে দেখা হয়, কফের মধ্যে টিবির জীবাণু আছে কিনা। ইদানিং আমার হাসপাতালে দুটো ল্যাব। একটায় মাইক্রোস্কপি হয়, অন্যটায় সিবিন্যাট মেশিন। এ মেশিন কিনে দিয়েছে সরকার। মূল্য—চল্লিশ লক্ষ টাকা। মাত্র দু-ঘণ্টায় প্রায় ৯৯ ভাগ নিশ্চিত হয়ে বলা যায়—নমুনাতে টিবির জীবাণু রয়েছে, নাকি নেই। বলাই বাহুল্য, পরীক্ষাটি নিঃশুল্ক। এবং বলা বেজায় জরুরি যে—এই একই পরীক্ষার প্রাইভেট মূল্য—পাঁচটি হাজার টাকা।

ঢের ঢের ঢের শের পালোয়ান ভীম সিং দেখেছি আমি, যাঁরা ভেলোর মেলোর পয়সার জোর ফুঁকিয়ে ফাঁকিয়ে, শেষমেশ এসে দ্বারস্থ হয়েছেন আমার। ব্যক্তিগত "আমার" কাছে নয়, বরং বলা ভালো দ্বারস্থ হয়েছেন সরকারি পরিষেবার কাছে। সঙ্গে করে এনেছেন ঢাউস প্লাস্টিক ক্যারিব্যাগ ভর্তি রিপোর্ট, এবং অর্ধমৃত রোগী। সেসব রিপোর্টের অনেকগুলোর না আছে মান্যতা, না ছিল প্রয়োজন। প্রেসক্রিপশনগুলো তো আরও এককাঠি সরেস। দুনিয়ার হেনো অ্যান্টিবায়োটিক নেই, যেটা তেনার উপর বর্ষণ করা হয়নি। ফল? যা হবার তাই। ড্রাগ রেজিস্ট্যান্ট টিবি। সুস্থ হওয়ার সম্ভাবনা—শতকরা ষাট থেকে সত্তর ভাগ।

বেসরকারি হাসপাতালে একবচ্ছর পর্বতসমান ধৈর্যের সাথে ট্রায়াল মেরে আসা এই রোগীটিই, আমার কাছে এসে নীতিশিক্ষক হয়ে উঠেছেন—"মানবিক হতে শিখুন ডাক্তার . . . বেফালতু না হেজিয়ে, জলদি ওষুধ লিখুন।" আমি এসবে আগে রাগ করতাম। বেশ খানিকটা কষ্টও পেতাম। এখন আর পাই না। এখন বুঝে গেছি—সরকারি ডাক্তার, শুনে যাবে বার বার—তুই শালা সন্তান বেওয়ারিশ কুত্তার। এখন তাই, ধরেই নিয়েছি আমার বাবার নাম সারমেয়। তাই আজকাল গায়েই লাগে না আর।

তা সে যাকগে। কথা হচ্ছিল পুঁপাঁ নিয়ে। গুটি গুটি পায়ে ল্যাবে ঢুকে চমকেই গেলাম। তারজালি দেওয়া তাক-এ সারসার স্লাইড বসানো। ওগুলো—স্টেইন করে রাখা হয়েছে . . . রং শুকোলে পরে, তারপর দেখা হবে অণুবীক্ষণের তলায়। তার মাঝখানের এই যে এই মিনিট পাঁচেক সময়, এই সময়টাতে, ল্যাব টেকনিশিয়ান সূর্য চেয়ারে হেলান দিয়ে বসে আছে। চোখ তার বোজা। মাথা তার হেলানো। আর . . . ঠিক তার উলটো দিকের চেয়ারে, বাঁশি বাজাচ্ছে সমীরণ। সমীরণও পেশায় ল্যাব টেকনিশিয়ান। এসেছে "আর বি আর সি" করতে।

আর বি আর সি মানে হল, random blinded rechecking। বিষয়টা একটু খুলে বলি। তাহলে হয়তো-বা সরকারি স্বাস্থ্য পরিষেবার উপরে আরেকটু বেশি ভরসা জন্মাবে আপনাদের। ধরুন, রাম নামক ল্যাব টেকনিশিয়ান, একটি কফের নমুনা পরীক্ষা করল। এবং খুঁজে পেল পঞ্চাশটি টিবি-র জীবাণু। কিন্তু রাম তো মানুষ। "মর্যাদা-পুরুষোত্তম" তো নয় মোটেই। আর মানুষ মাত্রেই ভুল হয়। তাই রামেরও ভুল হতেই পারে। অথচ এক্ষেত্রে তো ভুল মানে চিত্তির।

রামের রিপোর্টের ওপর নির্ভর করেই ওষুধ দেওয়া হবে রুগীকে! যদি সে ওষুধ খামোখাই দেওয়া হয়? যদি আদৌ রোগীর টিবি না থেকে থাকে? যদি রামবাবু, অমনোযোগী হয়ে, বা কাজে ফাঁকি মেরে ভুল রিপোর্টিং করে থাকে?

অ্যাই! এইখানেতেই সরকারি স্বাস্থ্য ব্যবস্থা বেসরকারিগুলোর থেকে আলোকবর্ষ এগিয়ে। সরকারি ব্যবস্থাতে রামবাবুর রিপোর্ট করা স্লাইড খতিয়ে দেখবেন শ্যামবাবু। শ্যামবাবু যদি দেখতে পান যে রামবাবু ভুল রিপোর্টিং করেছেন, তবে তিনি ডাকবেন যদুবাবুকে। যদুবাবু এসে ফিরসে খতিয়ে দেখবেন নমুনা। নির্ধারণ করবেন রামবাবু ঠিক নাকি শ্যামবাবু। এবং এই সম্পূর্ণ বিষয়টি ঘটবে—র‍্যান্ডামলি, এবং ব্লাইন্ডলি। অর্থাৎ,শ্যামবাবু জানতেও পারবেন না, তিনি কার

অর্থাৎ,শ্যামবাবু জানতেও পারবেন না, তিনি কার স্লাইড পুনর্পরীক্ষা করছেন। আর তাই বন্ধুপ্রেম বা চোট্টামির সম্ভাবনা নেই। এবং এই জন্যই, টিবি-র নির্ণায়ক পরীক্ষা বেসরকারির থেকে সরকারি ঢের ঢের গুণে বেশি মজবুত।

স্লাইড পুনর্পরীক্ষা করছেন। আর তাই বন্ধুপ্রেম বা চোট্টামির সম্ভাবনা নেই। এবং এই জন্যই, টিবি-র নির্ণায়ক পরীক্ষা বেসরকারির থেকে সরকারি ঢের ঢের গুণে বেশি মজবুত।

তো সেই "আর বি আর সি" করতে আসা সমীরণ বাঁশি বাজাচ্ছে, ক্ষণিকের অবসরে। শ্রোতা—সূর্য। আমি, থমকে গিছলাম। সমীরণ আপাত ফেকলু ছেলে। ছ্যাড়াভ্যাড়া প্যান্ট। কুঁচকানো জামা। অধিকাংশ ল্যাব টেকনিশিয়ানই তাই। কতটুকুই বা আর মাইনে! চুপচাপ আসে, নিশ্চুপে কাজ সারে, গুটিগুটি বেরিয়ে যায় . . . সশব্দ অস্তিত্ব প্রমাণের, অযথা চেষ্টাটুকুও নেই। অথচ, এঁরাই হলেন টিবি চিকিৎসার মেরুদণ্ড। এঁরাই প্রকৃতপক্ষে নির্ধারণ করেন রোগীর টিবি আছে, নাকি টিবি নেই। The unsung hero। নেপথ্য নায়ক।

নেপথ্যের নায়ক তো আছেন আরও কতজনই। STS- Senior TB Trearment Supervisor, STLS-Senior TB Laboratory Supervisor। আশা-কর্মী, সাবসেন্টারের সিস্টার . . . কেউ কি জানে এঁদের কথা? কেউ কি কখনো জানতে পেরেছে? আসুন, আজ এঁদেরই গপ্পো বলি। পুঁ পুঁ বাজনা, একটু না হয় অপেক্ষা করুক।

রোজ গিয়ে চেয়ারে বসি যখন, উপসর্গ খুঁজে নিয়ে, রোগীকে পাঠাই কফ পরীক্ষা করতে। ব্যস। আমার দায়িত্ব বলতে গেলে, এইখানেই শেষ। এরপর সেই কফ নেড়েঘেঁটে দেখবে LT/ল্যাব টেকনিশিয়ান। যদি টিবির জীবাণু ধরা পড়ে, তবে রোগী চলে যাবে নিকটবর্তী উপস্বাস্থ্য কেন্দ্রে। সেখানকার সিস্টার, তাঁকে নিয়ম করে ওষুধ খাওয়াবেন। STS নজর রাখবেন পুরো বিষয়টার উপর। আর STLS পরিচালনা করবেন, ল্যাবরেটরি ঠিকঠাক চলছে কিনা।

সিম্পল বিষয়। তাই না?

চলুন তাইলে একদিন ডা. সব্যসাচী সেনগুপ্ত আর STS অসীমাভর একটা টেলিফোনিক কথোপকথনে আড়ি পাতা যাক। সময়, বেলা এগারোটা। স্থান—টি বি হাসপাতাল আউটডোর। ডাক্তারবাবু রাগত মুখে, ফোন লাগালেন অসীমাভকে। অতঃপর—

কিড়িরিরিরিং কিড়িরিরিরিং . . . খচাৎ

—হ্যাঁ স্যার বলুন।

—এই অসীমাভদা . . . ঝগড়ু ওরাঁও-কে যে পাঠালাম . . . ঠিকঠাক ওষুধ খাচ্ছে তো?

—না স্যার . . . আসল-এ . . .

—কী আসল-এ? অ্যাঁ? ইয়ার্কি মারছেন নাকি? তিনদিন হয়ে গেল ডায়াগনোজড হয়েছে পেশেন্ট। এখনও ওষুধ খাচ্ছে না কেন?

—স্যার কথাটা শুনুন আগে। ঝগড়ুর ওষুধ শুরু করবার আগে রুটিন মাফিক ওর বাড়ি গিছলাম। সাবসেন্টার দিদিমণি সঙ্গেই ছিল . . . জিগ্যেস করে দেখবেন।

—হ্যাঁ। তোহঃ? তাতে কী? সে তো যেতেই হবে। না হলে দিনকয়েক পরে, বাঁদরামি করে রুগী যদি ওষুধ খেতে না চায় . . . বাড়ি গিয়ে ধরবেন কী করে? এটা তো রুটিন . . .

—স্যার আপনি শুধুমুদু রাগ করছেন। আমিও তো বললামই যে রুটিন। কেসটা হল তারপর। বাড়ির লোক বলল—ঝগড়ু ওষুধ খাবে না। পালিয়েছে . . . পালিয়ে গিয়ে লুকিয়ে আছে মাছিমারির চরে।

—আর সেই শুনে আপনারা চলে এলেন? বাহঃ।

—আররররেহ শুনুন না স্যার। আমি আর দিদি মিলে তারপর গেলাম মাছিমারি। ঝগড়ু, আমাদের দেখেই, ঝাঁপ দিয়ে নদীতে নেমে গ্যালো। তারপর সাঁতরে গিয়ে উঠল একটা চর-এ। আমিও যেতাম . . . কিন্তু সাঁতার জানি না স্যার . . .

—বাহঃ । গুড। তাহলে তো আপনার সাতখুন মাফ। কী আর বলব বলুন? স্টেট টিবি সেল-এর কাছে মাথা নীচু করতে হবে বাধ্য হয়ে।

খটাস। ফোন কাটা হল।

একদিন পরের ঘটনা।

স্থান—ওই। সময় দুপুর তিনটে। ডা. সেনগুপ্তের মোবাইল বেজে উঠলো—ও হো হো . . . খোয়া খোয়া চাঁদ (রিংটোন)। কলার আই ডি—অসীমাভ।

— হ্যাঁ হ্যালো . . . বলুন . . .

—স্যার স্যার . . . অপারেশন সাকসেসফুল। ঝগড়ু ওষুধ খেয়েছে আজ।

—বলেন কী? কী করে হল শুনি?

—স্যার গুপ্তচর রেখেছিলাম স্যার . . . নদীর এই পাড়ে। ঠিক জানতাম মালটা পাড়ে আসবেই মদের নেশা চাগাড় দিলে। যেই এসেছে, ওমনি স্যার ক্যাঁক করে চেপে ধরে, গুপ্তচর আমায় খবর দিয়েছে।

—বাহঃ বাহঃ . . . তারপর কী করলেন? খিস্তি করলেন ধরে? বকে দিয়েছেন তো আচ্ছাটি . . .

—না না . . . পাগল নাকি স্যার? তারপর হিউম্যান রাইটস এসে আমাকে আপনাকে কোমরে দড়ি পরাক আর কি? বকিনি স্যার। আধা ঘণ্টা ধরে বুঝিয়েছি। পঞ্চায়েতকে সাক্ষী রেখে ওষুধ গিলিয়েছি সামনে বসিয়ে . . .

—গুড। থ্যাঙ্কু অসীমাভবাবু।

মাথায় রাখবেন এই প্রোগ্রামের মূলমন্ত্র। রোগীকে ওষুধ খাওয়ানোটা আপনার দায়। থ্যাঙ্কু আরও একবার। . . . ও ভালো কথা . . . শুনুন . . . পেশেন্টকে 'মাল' বলে ডাকবেন না . . . মিডিয়া শুনতে পেলে হেডলাইন করে দেবে।

খটাৎ। ফোন রাখা হল।

দ্বিতীয় কথোপকথন

—রবীনদা , মানসী চক্রবর্তী যে দু-মাস হল ওষুধ খাচ্ছে . . . ওনার ফলো আপ কফ পরীক্ষা করা হল না কেন?

—স্যার, মানসী তো কফ দিতে আসতেই চায় না। কিছু বললেই বলে—সব্বাই জেনে যাবে . . .

—আরে অদ্ভুত কথা বলছেন রবীনদা আপনি . . . কফ পরীক্ষা না হলে বুঝব কেমন করে, রোগ বাড়ল না কমল? শুনুন, কাল দরকার হলে মানসীর বাড়ি গিয়ে কফের স্যাম্পেল নিয়ে আসবেন। কেমন?

—ওক্কে স্যার . . .

সংক্ষিপ্ত কথোপকথন দু-টি শেষ হল। কী বুঝলেন? একটু হলেও কি মগজে ঢুকল, ঠিক কী-ই-ই-ই প্রকার পরিষেবাটা আপনাকে দিচ্ছে সরকার? আপনি চায়ে চুমুক মেরে বলবেন—"ধুৎ . . . আমার কি টিবি হয়েছে নাকি? তাইলে পরিষেবা আবার কীসের?" তাহলে আপনার জ্ঞাতার্থে বলি—

যদি কোনো টিবি রোগীর চিকিৎসা না করা হয়, তবে সেই রুগী প্রতি বছরে দশ থেকে পনেরো জনকে এই রোগ ছড়িয়ে দেবে। এই দশ পনেরো জন আবার ছড়াবে আরও দশ পনেরো জনকে। এবং তারপর তারাও . . .

ঢুকল? মাথায়? যদি ঝগড়ু ওষুধ না খায়, তা হলে আপনার ঝঞ্ঝাট ঠিক কোনখানটায়? আর এইভাবে যাতে টিবি সর্বগ্রাসী রোগ হয়ে আপনাকেও না গিলে খায় . . . সে বিষয়টা সুনিশ্চিত করছে কারা? এই LT, STLS, STS, ASHA, ANM এনারা।

ডাক্তার সব্যসাচীকে বাহবা না দিয়ে, বরং এঁদের স্যালুট করুন। বিশ্বাস করুন আর নাই করুন, আমি, সব্যসাচী সেনগুপ্ত, গীতাতে হাত দিয়ে শপথ নিয়ে সজ্ঞানে বলছি, যদি এই সরকারি কর্মচারীরা না থাকত, তবে আজ এ লেখা আপনাকে পড়তে হত হাসপাতালের বেডে শুয়ে। অথবা, চিতায় . . . এটা এতটুকু বাড়িয়ে বলছি না। সন্দেহ হলে, একটু পড়াশুনা করে খতিয়ে দেখতে পারেন।

লেখা বড়ো হচ্ছে। বড়ো লেখা কেউ পড়ে না। দায়সারাভাবে পাতা উলটে চলে যায়। জিজ্ঞাসা করলে বলে, "ও হ্যাঁ, খুব ভালো লেখা! কী দরদিইইই ডাক্তার।"

ধুৎ। ওরে পাগলা, আমি স্রেফ বক্কা মারি রে। আসল কাজ করে, ওই যাঁদের কথা বললাম। পুঁপাঁ-টা শেষ করি। সমীরণের বাঁশি শেষ হতে হতে আমার মন এলোমেলো হয়ে গিয়েছিল। সামান্য মাইনের

হতে হতে আমার মন এলোমেলো হয়ে গিয়েছিল। সামান্য মাইনের একজন কর্মচারী সমীরণ। যখন তখন গালাগাল খায় আমার কাছে। "ঘরেতে অভাব, পৃথিবীটা তাই মনে হয় কালো ধোঁয়া"। সেই সমীরণ কী অনায়াসে ছাড়পত্র পেয়ে গেছে গন্ধর্বলোকের।

একজন কর্মচারী সমীরণ। যখন তখন গালাগাল খায় আমার কাছে। "ঘরেতে অভাব, পৃথিবীটা তাই মনে হয় কালো ধোঁয়া"। সেই সমীরণ কী অনায়াসে ছাড়পত্র পেয়ে গেছে গন্ধর্বলোকের।

সমীরণের সেদিনের সেই বাঁশি, আমার দৃষ্টিভঙ্গিটাই পালটে দিয়েছিল। এতদিন প্রচ্ছন্ন শ্রদ্ধা ছিল, এঁদের কাজের প্রতি ডেডিকেশনের দেখে। এখন সেই প্রচ্ছন্ন শ্রদ্ধাটাই প্রকট হল মানুষ সমীরণদের উপরে। সমীরণেরই আমন্ত্রণে সেই বিকেলে ওদের আড্ডাখানায় গিয়েছিলাম। STS, STLS, LT-দের ঘরোয়া সমাগমে। সারাদিন কুত্তার খাটনি খেটে সেই আড্ডাতে বাঁশি বাজাচ্ছে ওরা। তবলায় আরেকজন। হারমোনিয়ামে সুর ছড়িয়ে যাচ্ছে সমস্ত ঘর জুড়ে।

আমি, সব্যসাচী সেনগুপ্ত, আজ সমস্ত মানবজাতির প্রতিভূ হয়ে, তোমাদের ধন্যবাদ জানাচ্ছি ভাই। তোমরা আছ . . . তোমরা, . . . অজস্র অভাব অনটন সহ্য করেও কর্তব্যনিষ্ঠ আছ বলেই, আজ আমি এবং আমরা, বেঁচে আছি। স্বাস্থ্যের বৃত্তে

ডা. সব্যসাচী সেনগুপ্ত, এমবিবিএস, টিবি হাসপাতালের চিকিৎসক।

হাসপাতালের অতিথি

ডা. ঐন্দ্রিল ভৌমিক

সরকারি হাসপাতালে কিছু রোগী বিছানা দখল করে বছরের পর বছর থেকে যায়। গৃহহীন, খাদ্যহীন, আত্মীয়স্বজনহীন নরনারীর এর থেকে ভালো থাকার জায়গা আর কীই-বা হতে পারে। তিন বেলা খাবার, মাথার উপর পাখা, লোডশেডিং হলে সাথে সাথে জেনারেটর, রোজ নতুন নতুন রঙের চাদর, চাইলেই হাসপাতালের ড্রেস আর না চাইলেও চারপাশে কথা বলার অজস্র মানুষ। তার সাথে আবার অসুখবিসুখ করলেই ফ্রি-তে চিকিৎসা।

মোদ্দা কথা একজনের বাঁচার জন্য যা যা দরকার একটা সরকারি হাসপাতালে পুরোটাই মেলে এবং সম্পূর্ণ নিখরচায়।

আমি যখন খড়গ্রাম গ্রামীণ হাসপাতালে চাকরি করতাম, তখন মকিনা (নাম পরিবর্তিত) বলে একজন হাঁপানির পেশেন্ট ভর্তি ছিল। আমি যে ডাক্তারবাবুর বদলি হয়ে গেছিলাম সেই দাদা হাসপাতালের সাথে আমাকে মকিনার চার্জ হ্যান্ড ওভার করে গেছিলেন।

মকিনার সারা গায়ে আবে ভর্তি। দেখতে অত্যন্ত কদাকার। ভিক্ষে করে খাওয়া ছাড়া ওর আর কোনো গতি নেই।

শ্বাসকষ্ট কম থাকলেই সে ভিক্ষা করতে বেরিয়ে পড়ত। আবার দুপুরের খাওয়ার সময় ঠিক ফেরত আসত। ঈদ বা অন্য কোনো অনুষ্ঠানের দিনে বাইরে কোথাও খাবার জুটে গেলে কিচেনের কাউকে ফোন করে বলে দিত খাবে না।

খাবার নষ্ট হোক সে কোনো দিনও চাইত না। কোনো রোগী হাসপাতালের খাবার খেতে না চাইলে সে বোঝাত, 'দেখ আমি পাঁচ বছর ধরে হাসপাতালের খাবার খাচ্ছি। এখনও একবারও পেটের রোগ হয়নি।' তার ওই কদাকার চেহারার দিকে চেয়ে রোগীরা আদৌ ভরসা পেত কিনা জানি না।

আমি খড়গ্রাম হাসপাতালে যোগ দিয়েই মকিনাকে হাসপাতাল থেকে ছুটি করানোর জন্য উঠেপড়ে লেগেছিলাম। মকিনা আমায় বলেছিল, 'ডাক্তারবাবু, আমি পাঁচ বছর ধরে আছি, আর তুমি দু-দিন এখানে এসেই আমাকে তাড়াবে। দেখা যাক তোমার কত ক্ষমতা।'

আমার ইগো রীতিমত আহত হয়েছিল। প্রথম কয়েকদিন এসিএমওএইচ অফিসে দৌড়াদৌড়ি করলাম মকিনাকে সরানোর জন্য।

শেষে একদিন তিন-চারজন সিস্টার দিদি মিলে বলল, 'থাকুক না ডাক্তারবাবু। মকিনা অনেকদিন ধরে আছে। মায়া পড়ে গেছে। তাছাড়া ও সেরকম ক্ষতিকর নয়।'

আমি বললাম, 'কিন্তু হাসপাতালের একটা অমূল্য বেড দিনের পর দিন আটকে রাখবে?'

দিদিরা বলল, 'আমরা একা একা নাইট করি। রাতে কিছু ঝামেলা হলে মকিনা পাশে দাঁড়ায়। মাতাল-দাঁতাল, নেতা-মন্ত্রী কোনো কিছু মানে না। আমাদের সাথে কেউ খারাপ ব্যবহার করলে ও গালাগালি দিয় তার ভূত ভাগিয়ে দেয়। এমনিতেই তো আমাদের হাসপাতালে একটা সিকিউরিটির লোকও নেই।'

অতএব মকিনা থেকে গেল। সাড়ে তিনবছর পরে ওই হাসপাতাল থেকে আমার বদলি হওয়ার সময় মকিনাই সবথেকে বেশি কেঁদেছিল।

শহরের হাসপাতালে আসার পর আবার অন্য অভিজ্ঞতা হল। মকিনার না হয় সাতকুলে কেউ নেই। কিন্তু এখানে যে সব রোগী ভর্তি থাকে তাদের অনেকেরই ছেলে মেয়ে, নাতিপুতি সব আছে।

তা সত্ত্বেও বছরের পর বছর রোগী বেড আটকে হাসপাতালে পরে থাকে। ছুটি লিখলে বাড়ির কেউ নিতে আসে না।

আমাদের হাসপাতালের মেল এক নম্বর ওয়ার্ডে একজন পেশেন্ট ভর্তি ছিল প্রায় আড়াই বছর। বাড়ির লোকের কোনো সাড়াশব্দ পাওয়া যায়নি। সে মারা যাওয়ার পরে বাড়ির লোকের ঢল নামল। সুন্দর সুন্দর পোশাক-আশাকের পুরুষ ও নারীরা ব্যস্ত ওয়ার্ডে ঘন ঘন যাতায়াত শুরু করল। কিছুক্ষণের মধ্যে কানে এল আলোচনা, এই সব সরকারি হাসপাতালে কোনো চিকিৎসা হয় না। তাদের রোগী সম্পূর্ণ বিনা চিকিৎসায় মারা গেছে।

মৃত মানুষটি তখনও যে জামাকাপড় পরে আছে সেটা কোনো ডাক্তারবাবুর। তার বিছানার পাশে টেবিলের উপর যে থালাবাসন রয়েছে সেটা কোনো সিস্টার দিদির দেওয়া।

কী আর জবাব দেব। মৃত মানুষটি তখনও যে জামাকাপড় পরে আছে সেটা কোনো ডাক্তারবাবুর। তার বিছানার পাশে টেবিলের উপর যে থালাবাসন রয়েছে সেটা কোনো সিস্টার দিদির দেওয়া। প্রতিদিন পরম যত্নে এবং বিনা স্বার্থে তার মল মূত্র পরিষ্কার করে দিয়েছে

ওয়ার্ডের কোনো আয়া দাদা অথবা সুইপার। অশক্ত মানুষটিকে ধরে ধরে দিনের পর দিন তারাই খাইয়েছে।

এদের মতো নোংরা নরকের কীটের কোনো প্রশ্নের জবাব দিতেও ঘৃণা বোধ হয়।

ফিমেল ওয়ার্ডে দীর্ঘদিন ধরে ভর্তি আছে অন্তত পাঁচজন মহিলা। তার মধ্যে একজনের ছেলে ছেলের বউ নাতিপুতি সব আছে। ছেলে

গত বছর নবমীতে এই সব মানুষগুলির জন্য হাসপাতালের ওয়ার্ডে বড়ো পর্দায় পুজোপরিক্রমা দেখার ব্যবস্থা করা হয়েছিল। এবার আশা করা যায় আরও বড়ো পর্দার ব্যবস্থা হবে।

লায়েক হওয়ার পর ঘাড় ধরে তাকে বাড়ি থেকে বের করে দিয়েছে। এখান-ওখান ঘুরে তার ঠাঁই হয়েছে আমাদের হাসপাতালে।

বুড়ি বলে, 'ছেলের জন্য আমার মন খারাপ হয় না। মন খারাপ হয় নাতি দুটোর জন্য। ওরা আমার বড্ড ন্যাওটা ছিল।'

কেউ টাকা পয়সা দিলে, জামা কাপড় দিলে বুড়ি জমিয়ে রাখে। পুজোর আগে বাড়ি যায়। নাতিদের জন্য জামা কিনে নিয়ে যায়। এমনকী নিজের সুপুত্রের জন্যেও জামাকাপড়। দিয়ে সেদিনই ফেরত আসে।

ইদানীং আরেকটা ট্রেন্ড শুরু হয়েছে। দুর্গা পুজোর ঠিক আগে আগেই অনেকেই বাড়ির বয়স্ক লোকটিকে হাসপাতালে ভর্তি করে যাচ্ছেন। আবার পুজো কাটলে ফেরত নিয়ে যাচ্ছেন। হাসপাতালে বাড়ির বয়স্ক মানুষটিকে গ্যারেজ করে তারা নিশ্চিন্তে রাজস্থান, লে লাদাখ অথবা কাশ্মীর ঘুরে আসছেন।

গত বছর নবমীতে এই সব মানুষগুলির জন্য হাসপাতালের ওয়ার্ডে বড়ো পর্দায় পুজোপরিক্রমা দেখার ব্যবস্থা করা হয়েছিল। এবার আশা করা যায় আরও বড়ো পর্দার ব্যবস্থা হবে।

দয়া করে কেউ বৃদ্ধ মানুষকে বাড়িতে একা রেখে বেড়াতে চলে যাবেন না। নানা রকম বিপদ-আপদ ঘটতে পারে। তার চেয়ে তাদের আমাদের পানিহাটি হাসপাতালে ভর্তি করে যেখানে খুশি গিয়ে স্ফূর্তি করুন। দেখবেন, হাসপাতালে তাদেরও সময় খারাপ কাটবে না।

স্বাস্থ্যের বৃত্তে

ডা. ঐন্দ্রিল ভৌমিক, এমবিবিএস, এমডি, একটি সরকারি হাসপাতালের মেডিসিন বিভাগের ভারপ্রাপ্ত চিকিৎসক।

Advt.

এখন **দুর্বার ভাবনা** পাওয়া যাচ্ছে

শিলিগুড়িতে বুকস, কুচবিহারে পার্থ লাহিড়ী, এন এইচ রোড, নবদ্বীপের পোড়ামাতলায় সুজয়া প্রকাশনী, পশ্চিম মেদিনীপুরের ভূর্জপত্র (বিদ্যাসাগর ইউনিভার্সিটি রোড), শান্তিনিকেতনে সুবর্ণরেখা।

কলকাতায়

হাওড়া স্টেশন (কলকাতা বাসস্ট্যান্ড, হাওড়া বাসস্ট্যান্ড), শিয়ালদহ স্টেশন (সানশাইন বুকস্টল, রামকৃষ্ণ পুস্তকালয় ও অন্যত্র), কলেজ স্ট্রিট (পাতিরাম, বুক মার্ক, মনীষা গ্রন্থালয়, বই-চিত্র ও অন্যত্র)।

রাসবিহারী মোড়, ফুলবাগান (বেলেঘাটা), হাতিবাগান, শ্যামবাজার (পাঁচমাথার মোড়), ঢাকুরিয়া (দক্ষিণাপণের বিপরীতে), বইকল্প (দোতলায়),

বিধাননগর (উল্টোডাঙা) স্টেশন ও অন্যত্র।

যাঁরা পত্রিকার এজেন্সি নিতে চান এই ঠিকানায় যোগাযোগ করুন-১২/৫ নীলমণি মিত্র স্ট্রিট, কলকাতা-৭০০০০৬।

১৯৭৯-র ডিসেম্বরে দল্লিরাজহরার ভিলাই স্টিল প্ল্যান্ট হাসপাতালে চিকিৎসক ও সেবিকাদের অবহেলায় প্রাণ হারান লোহা-খনির ঠিকাদারি শ্রমিক কুসুমবাই। প্রসূতি কুসুমবাই ছত্তিশগড় মাইন্স শ্রমিক সংঘের উপাধ্যক্ষা ছিলেন। কুসুমবাইয়ের মৃত্যুতে শ্রমিকরা শপথ নেন নিজেদের এক মাতৃসদন গড়ে তোলার। শেষে মাতৃসদন নয়, গড়ে ওঠে শহীদ হাসপাতাল। আর এক বিশাল জনস্বাস্থ্য আন্দোলন।

কুসুমবাই-সন্দীপ্তাকে মনে রেখে

মেয়েদের স্বাস্থ্যভুবন

ঠিক ৩৩ বছর পর ২০১২-এর ২ ডিসেম্বর চিকিৎসকদের অবহেলায় প্রাণ যায় সাংবাদিক সন্দীপ্তা চ্যাটার্জীর। “সন্দীপ্তাকে মনে রেখে” মহিলাদের স্বাস্থ্যসচেতনতার এক প্রয়াস।

কুসুমবাই ও সন্দীপ্তা যেন এক সূত্রে বাঁধা। তাই *স্বাস্থ্যের বৃত্তে* পত্রিকায় কুসুমবাই-সন্দীপ্তাকে মনে রেখে “মেয়েদের স্বাস্থ্য ভুবন”।

গো স্বাস্থ্য বনাম মায়ের স্বাস্থ্য

ডা. সঞ্জীব মুখোপাধ্যায়

অক্সিটোসিন। প্রসবের আগে বা পরে বহুল ব্যবহৃত এই ওষুধটি (যা সাধারণত ওষুধের দোকানে ‘সিন্টোসিনন’ বা ‘পিটোসিন’ ইঞ্জেকশন নামে পাওয়া যায়) গত তিন মাস ধরে অভূতপূর্ব এক কারণের জন্যে সংবাদপত্রের শিরোনামে।

অক্সিটোসিন কী?

এটি একটি প্রোটিন হরমোন যা মস্তিষ্কের ভেতরে অবস্থিত পিটিউটারি গ্রন্থির পেছনের অংশ থেকে বেরিয়ে রক্তে প্রবেশ করে। প্রত্যক্ষভাবে এটি কাজ করে নারীদেহে, মূলত গর্ভাবস্থায় জরায়ুর মাংসপেশির ওপর। প্রসব-বেদনা শুরু হওয়ায় এর ভূমিকা আছে। আবার প্রসব হয়ে গেলে জরায়ুর মাংসপেশিকে স্থায়ীভাবে সংকুচিত হতে সাহায্য করে—যাতে প্রসবের পরের রক্তপাত বন্ধ হয়। এছাড়া এই হরমোনটি স্তনগ্রন্থির চারদিকে যে মাংসপেশি থাকে তাকে সংকুচিত করে স্তন থেকে স্তন্যপানের সময় দুধ বেরোতে সাহায্য করে। এছাড়া মহিলা ও পুরুষ উভয়ের ক্ষেত্রে এই হরমোনটির প্রভাব পড়ে তার যৌন ও সামাজিক ব্যবহারে।

এই হরমোনটিকে পরীক্ষাগারে তৈরি করা হয় ১৯৫০ সালে—উদ্দেশ্য ছিল এটির জরায়ুর পেশি সংকোচনের ধর্ম কাজে লাগিয়ে কৃত্রিমভাবে প্রসব-বেদনা শুরু করা ও প্রসব-পরবর্তীকালে প্রসবজনিত রক্তপাত বন্ধ করা। তখন থেকেই এই ইঞ্জেকশনটিকে চিকিৎসকের সাহায্যে প্রসব করানো ও তার পরবর্তীকালে প্রসূতি পরিচর্যায় এক অপরিহার্য ওষুধ বলে ধরা হয়।

প্রসবের অব্যবহিত পরে—মায়েদের যে রক্তস্রাব হয়—তাকে প্রতিরোধ করার জন্যে বা বেশি রক্তপাতের চিকিৎসার জন্যে আর কিছু ওষুধ (যেমন মিথাইল আরগোমেট্রিন বা প্রোস্টাগ্লানডিন) থাকলেও তাদের পার্শ্বপ্রতিক্রিয়ার জন্য বা বেশি দামের জন্য ২০০০ সাল নাগাদ বিশ্বস্বাস্থ্য সংস্থা এই অক্সিটোসিন ইঞ্জেকশনকে জরুরি ওষুধ হিসেবে, প্রসবের ঠিক পরে-পরেই মা-কে দিতে হবে, এই মর্মে প্রসবকালীন নিয়মাবলির অঙ্গ হিসেবে প্রকাশ করে। এতদিন কোনো বড়ো সমস্যা ছাড়াই এই ওষুধ ব্যবহার হয়ে আসছিল ও ছোটো বড়ো যেকোনো ওষুধের দোকানে এটি পেতে কোনো অসুবিধে ছিল না। ভারতবর্ষে ১৫-টি কোম্পানি এটি প্রস্তুত করে। দাম প্রতি অ্যাম্পুলে ১০ টাকা থেকে ১৫ টাকা।

হঠাৎ বাদ সাধল ভারত সরকারের এক আদেশনামা। জুন মাসের এক আদেশনামায় স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ দপ্তর জানায় যে ১ জুলাই, ২০১৮ থেকে এই ইঞ্জেকশনটি কর্নাটকের একটি সরকারি প্রতিষ্ঠান (KAPL) ছাড়া আর কোনো কোম্পানি ভারতবর্ষে ব্যবহারের জন্য উৎপাদন করতে পারবে না। খুচরো ওষুধের দোকানে এই ওষুধটি পাওয়াও যাবে না। বিদেশ থেকে এটি আমদানি করা যাবে না।

কেবলমাত্র চিকিৎসা পরিষেবাদায়ী হাসপাতাল বা নার্সিংহোমগুলি সোজাসুজি ওই কোম্পানিটির কাছে চাহিদা জানিয়ে ওষুধটি সংগ্রহ করতে পারবে।

সারা ভারতের চিকিৎসক সমাজ—বিশেষত প্রসূতি ও স্ত্রীরোগ বিশেষজ্ঞরা এই পদক্ষেপের তীব্র প্রতিবাদ করেন। তাঁরা প্রমাণ দিয়ে দেখান যে ভারতে প্রসবকালীন মাতৃমৃত্যু-হার খুবই বেশি, এবং এর মুখ্য কারণ প্রসবকালীন রক্তপাত। এই রক্তপাত বন্ধ করতে অক্সিটোসিন শুধু যে জীবনদায়ী, তাই নয়, জরুরি বা আপৎকালীন ওষুধের তালিকায় এটির অবস্থান ওপরের দিকে। ভারত সরকার প্রকাশিত প্রসব পরিচর্যা নিয়মাবলি অনুযায়ী প্রসবের ঠিক পর-পরই মা-কে দুই অ্যাম্পুল (১০ ইউনিট) অক্সিটোসিন ইঞ্জেকশন দিতে হবে—প্রসব যেখানেই হোক না কেন। এছাড়াও এই ওষুধটি চিকিৎসকের তত্ত্বাবধানে কৃত্রিমভাবে প্রসব বেদনা শুরু করার জন্যে বা প্রসব ত্বরান্বিত করার কাজেও ব্যবহৃত হয়।

এখন প্রশ্ন জাগে কী এমন ঘটল যে অক্সিটোসিন-এর মতো এক জরুরি ওষুধের উৎপাদন এবং বণ্টনকে এত কঠোরভাবে নিয়ন্ত্রণ করা হচ্ছে? কেন্দ্রীয় সরকারের স্বাস্থ্য দপ্তরের বক্তব্য অনুযায়ী এই ওষুধটির নাকি ব্যাপক হারে অপব্যবহার ঘটেছে দুগ্ধবতী গাইদের দুধের উৎপাদন বাড়াবার জন্যে। আর এই ইঞ্জেকশন পাওয়া গাভীর দুধ পান করলে নাকি মানবদেহে নানারকম অসুখ হওয়ার সম্ভাবনা। মজার কথা পরবর্তীকালে এ ব্যাপারে খোঁজ নিলে বিভিন্ন সরকারি দপ্তর জানায় যে গোরুর শরীরে এর ব্যাপক হারে ব্যবহারের কোনো খবর নেই বা এই ব্যাপারে কোনো অভিযোগও লিপিবদ্ধ নেই। আর মানবদেহের আন্ত্রিক ব্যবস্থায় এই ওষুধটির রাসায়নিক অণু অন্ত্রে অবস্থিত উৎসেচক দ্বারা অকেজো হয়ে যায়। তাই মানবদেহে ওইভাবে এর কোনো খারাপ প্রতিক্রিয়া ঘটে না।

কিন্তু কা কস্য পরিবেদনা। আবেদন-নিবেদনের ফলে সরকার ৩১ আগস্ট পর্যন্ত স্থিতাবস্থা বজায় রাখার কথা বলে। উপায়ান্তর না দেখে মানুষের জন্য কাজ করা কিছু সংগঠন দিল্লি হাইকোর্টের দ্বারস্থ হয় অক্সিটোসিন নিয়ে যে নিষেধাজ্ঞা জারি হয়েছে—তা বাতিল করার জন্যে।

সমস্যা হচ্ছে অনেকেই বুঝতে পারছেন না যে এই ওষুধটি কেবলমাত্র কিছু ক্লিনিক বা হাসপাতালে পাওয়া গেলেই হবে না। কেননা এখনও ভারতে শতকরা ২৫ ভাগেরও বেশি প্রসব হয় বাড়িতে বা হাসপাতালের বাইরে। তাই প্রত্যন্ত গ্রামাঞ্চলের ওষুধ দোকানেও এটি যাতে পাওয়া যায় তার ব্যবস্থা থাকা অত্যন্ত জরুরি। সারা ভারতে একটি মাত্র ওষুধ প্রস্তুতকারী সংস্থাকে এটির উৎপাদনের দায়িত্ব দিলে—এর সহজলভ্যতা, গুণমান বা দাম সবই বিঘ্নিত হওয়ার সম্ভাবনা।

শেষ খবর পাওয়া পর্যন্ত—সরকার এটিকে ওষুধ দোকানে বিক্রির অনুমতি দিয়েছে—কিন্তু এইচ-১ তালিকাভুক্ত করে। অর্থাৎ এটি কিনতে গেলে প্রেসক্রিপশন লাগবে ও এর বিক্রির লিখিত হিসেব রাখতে হবে। খুচরো ওষুধ বিক্রির দোকান এই নিদানে কতখানি রাজি হয় দেখার। এই কারণের জন্যেই পেথিডিন-মরফিন জাতীয় ওষুধগুলি খুব কম দোকানে পাওয়া যায়।

এদিকে আদালতেও শুনানি চলছে। মহামান্য আদালত ৩০ সেপ্টেম্বর পর্যন্ত স্থিতাবস্থার আদেশ দিয়েছেন। আর আবেদনকারীরা লড়াই চালু রাখার শপথ নিচ্ছেন—প্রস্তুতি নিচ্ছেন সর্বোচ্চ আদালতে যাওয়ার জন্যে।

আমরা প্রার্থনা করছি—লক্ষ লক্ষ মায়েদের স্বার্থে সরকারের শুভবুদ্ধির উদয়ের জন্যে। স্বাস্থ্যের বৃত্তে

ডা. সঞ্জীব মুখোপাধ্যায়, স্ত্রীরোগ বিশেষজ্ঞ, জনস্বাস্থ্য আন্দোলনের নেতৃস্থানীয় কর্মী।

একক মাত্রা Advt.
গদ্য প্রবন্ধের এক আধুনিক ক্যানভাস
সমাজ, রাজনীতি, অর্থনীতি, স্বাস্থ্য, মিডিয়া ও বিবিধ বিষয়ে এক অন্যতর গবেষণা ও আলোচনাপত্র
পাওয়া যাচ্ছে প্রায় সমস্ত স্টলে
গ্রাহক চাঁদা: ১০০ টাকা (বার্ষিক), ২০০ টাকা (বার্ষিক), ২০০০ টাকা (আজীবন)
আজীবন গ্রাহকেরা পুরনো সংখ্যার একটি সেট বিনামূল্যে পাবেন
যোগাযোগ: ১৫০, মুক্তারাম বাবু স্ট্রীট, কলকাতা ৭০০০০৭
দূরভাষ: ৯৮৩০২৩৬০৭৬/৯৮৩০৪৯৩২৩৯

বালবিধবা থেকে মহিলা ডাক্তার
ডা. হৈমবতী সেন-এর দিনলিপি থেকে

পর্ব ষোলো

প্রবীর গঙ্গোপাধ্যায়

‘ডা. হৈমবতী সেন-এর (১৮৬৬-১৯৩৩) দিনলিপি থেকে’ পঞ্চম বর্ষ, চতুর্থ সংখ্যা (এপ্রিল-মে, ২০১৬) থেকে ধারাবাহিকভাবে প্রকাশিত হচ্ছে। সংসার-সমাজ-প্রশাসন-সহ প্রায় এক সার্বিক প্রতিকূলতার বিরুদ্ধে হৈমবতীর একক-সংগ্রামকে অনুধাবন করতে গেলে তাঁর সময়কাল, পরিপার্শ্ব, সমাজ-সংস্কৃতিকেও খুঁটিয়ে জানতে হয়। সে কারণে দিনলিপির অনেক-আপাত-সম্পর্কহীন খুঁটিনাটি বিবরণও যথাসম্ভব এ-লেখায় রেখে দেওয়ার প্রয়াস নেওয়া হয়েছে।

আমি বৈঠকখানার এক কোনে চুপটি করে বসেছিলাম, কালীচরণ বসেছিল বারান্দায়। আমার কেবল ভয়, ও না আমাকে ফেলে রেখে পালিয়ে যায়। কিছু একটা ঠিক না হওয়া পর্যন্ত ওকে যেতে দিই কী করে। এইসব দুর্ভাবনা মাথায় নিয়ে বসে আছি, এমন সময় শুনলাম, ভারী গলায় কে যেন বলছেন: ‘তুমি স্বর্ণ না!’ কালীচরণ ‘আজ্ঞে, হ্যাঁ’ বলে তাঁকে হাত জোর করে নমস্কার করল। মানুষটি মমতা-মাখা গলায় ওর পরিবারের অন্যান্যদের কুশল সংবাদ নিলেন। তারপর জানতে চাইলেন: ‘তুমি এখানে কেন এসেছ স্বর্ণ?’ কালীচরণ বলল: ‘আমার সঙ্গে একজন মহিলা এসেছে। তার চিঠিটি আপনাকে আগেই পাঠিয়ে দেওয়া হয়েছে।’ ‘হ্যাঁ, আমি পেয়েছি। ও কি তোমার কেউ হয়?’ কালীচরণ জবাব দিল: ‘না, না, আমার কেউ হয় না, আমার এক আত্মীয়ের পরিচিত।’ মানুষটি বললেন: ‘হ্যাঁ, হ্যাঁ, রায়বাহাদুর আমাকে লিখেছেন, মেয়েটিকে তিনি ঘনিষ্ঠভাবে জানেন ও মেয়েটি একটি স্কুলে পড়াত। কিন্তু এক্ষুনি তো আমি কোনো মহিলার জন্যে থাকা-খাওয়ার বন্দোবস্ত করতে পারছি না। কেননা আজকেই আমি ইংল্যান্ড চলে যাচ্ছি। মেয়েটি

কোথায়?’ আমি উঠে দাঁড়িয়ে তাঁর পা ছুঁয়ে প্রণাম করতে গেলাম। তিনি আমাকে বাধা দিয়ে বললেন: ‘না, না, তোমাকে প্রণাম করতে হবে না।’ আমি মেঝের ওপর বসতে যাচ্ছি, তিনি ফের বললেন: ‘আরে, করছটা কী! তুমি ওই চেয়ারটায় বসো।’ আমি তাঁর কথামতো চেয়ারে বসলাম। তখন তিনি আমাকে বললেন: ‘তুমি রায়বাহাদুরের থেকে চিঠি এনেছ, আমি যদি এখানে থাকতে পারতাম তাহলে তোমার জন্যে কিছু-না-কিছু একটা ব্যবস্থা করাই যেত। কিন্তু বাছা, আমি আর ঘণ্টা দেড়েকের মধ্যেই ইংল্যান্ডে রওনা দিচ্ছি। এক্ষুনি তো আমি কিছু করতে পারছি না।’ তাঁকে জানালাম যে আমি একেবারেই নিঃসহায় নিঃসম্বল। তিনি পকেট থেকে পঞ্চাশটি টাকা বার করে আমার হাতে দিয়ে বললেন: ‘এখনকার মতো কোথাও একটা থাকার জায়গা ঠিক করে নাও। আমি ফিরে এসে তোমার জন্যে একটা পাকাপাকি ব্যবস্থা করব। আচ্ছা, তুমি স্বর্ণর পরিবারেই তো থাকতে পারো।’ এই কথা বলেই তিনি চলে গেলেন। আমি আর্দালিকে একটি টাকা দিয়ে উঠে দাঁড়ালাম। স্বর্ণ জিগেস করল: ‘এখন কোথায় যেতে চাও?’ বললাম: ‘শিবনাথ শাস্ত্রীর বাড়ি।’

গাড়িতে করে রওনা দিলাম তাঁর বাড়ির দিকে। সেখানেও দেখি, অনেকগুলো গাড়ি দাঁড়িয়ে। খোঁজ নিয়ে জানলাম, শিবনাথ শাস্ত্রীও আজই ইংল্যান্ড যাচ্ছেন।* হে ভগবান! এখন আমি কী করব? দুশ্চিন্তায় আতঙ্কে আমার মাথা খারাপ হওয়ার জোগাড়, চোখ ফেটে জল বেরিয়ে এল। এখন তো আমি বিপদ-সাগরে হাবুডুবু খাচ্ছি। যদি ওঁকে আমার দু-একটা কথাও জানাতে পারতাম তাহলে হয়তো কিছুটা হালকা হতে পারতাম। কিন্তু কেউ তো আমাকে ওঁর সঙ্গে দেখা করার অনুমতিই দিচ্ছে না। যখন সবাই দেখলেন, আমি কাঁদছি তখন ওঁকে খবর পাঠালেন। সরলা নামে একটি মেয়ে শাস্ত্রীমশায়কে জানাল: 'ওখানে একটি মেয়ে হাউহাউ করে কেঁদেই চলেছে।' শাস্ত্রীমশায় বললেন: 'ওকে এখানে নিয়ে এসো।' সরলা আমাকে ডাকল, আমি ভেতরে গেলাম। তাঁকে দেখা মাত্রই আমার ভেতরটা শ্রদ্ধায় ভক্তিতে পরিপূর্ণ হয়ে উঠল। তিনি দরদভরা গলায় আমায় জিগেস করলেন: 'তুমি কি আমার সঙ্গে দেখা করার জন্যে কান্নাকাটি করছ?' 'হ্যাঁ' বলে চারুবাবুর চিঠিটা তাঁর হাতে দিলাম। তিনি চিঠিটি পড়লেন। বললেন: 'দ্যাখো দেখি, কী দশা তোমার! এমন একটা সময়ে তুমি এলে যে এখন আমি তোমার জন্যে কিছুই করতে পারছি না।' আমি তাঁকে দুর্গামোহন দাশের কথাও জানালাম। তিনি বললেন: 'হ্যাঁ, তিনি আর আমি একসঙ্গেই বিলেত যাচ্ছি—আমাদের ব্রাহ্মসমাজের এক মনীষীর প্রতিকৃতি-চিত্র নিয়ে আসতে। এই মুহূর্তে তোমার জন্যে কোনোমতেই আমি কিছু করতে পারছি না। ছ-মাস পরে যখন ফিরে আসব তখন কিছু-না-কিছু একটা ব্যবস্থা নিশ্চয়ই করতে পারব।' বুঝতে পারলাম, এখানে আর বসে থেকে কোনো লাভ নেই। আর ভেতরে ভেতরে উদ্‌বেগ—কালীচরণ না আমাকে ফেলেই চলে যায়। বিষাদ-আচ্ছন্ন মন নিয়ে ওর কাছেই ফিরে এলাম।

কালীচরণ জিগেস করল: 'কী, হল কী?' মাথা নাড়লাম এইটা বুঝিয়ে দিতে যে আমাদের এ-যাত্রা নিষ্ফলা। তখন সে বলল: 'মানুষকে তো আর ঝেঁটিয়ে আস্তাকুঁড়ে ফেলে দেওয়া যায় না। এসো, আমার সঙ্গে। দেখি আমি কী করতে পারি।' ওর এই দরদ আমাকে ছুঁয়ে গেল, ভেতরে নতুন করে আশা জেগে উঠল। গাড়িতে উঠে বসলাম। গাড়ি চলতে শুরু করল। কোন পথে কোথায় যাচ্ছি—আমি কিছুই চিনি না, কিছুই জানি না। একসময় গাড়ি থামল। কালীচরণ নেমে গিয়ে কার সঙ্গে যেন কথা বলতে চলে গেল। আমি গাড়িতে বসে বসে ভাবছিলাম, এখন আমি কী করব? বাড়ি ফিরে যাব নাকি বেনারস? না কালীচরণের সঙ্গেই যাব? এইসব ভাবনায় যখন ডুবে আছি, কালীচরণ ফিরে এল। গাড়ি রাহাদের বাড়ি পৌঁছোলে তাঁদেরকে আনুপূর্বিক সব কথা বলা হল। গিন্নিটি বললেন: 'ততদিন তুমি স্বর্ণদের বাড়িতে গিয়েই থাকো না কেন? তোমার কোনো ভয় নেই। ওঁরা বেশ বড়োলোক, লোকেও ওঁদের মান্যিগণ্যি করে। ওঁরাই তোমার বাকি জীবনের ভরণপোষণ চালিয়ে নিতে পারবেন। ওঁরা আমাদের এদিককার জমিদার। কত শত মানুষকে যে ওঁরা পালেন পোষেন, তার কি লেখাজোকা আছে।' আমি যেন একটু ভরসা পেলাম।

এবার মনের ভেতর থেকে ঠিক করে নিলাম—যাই ঘটুক না কেন, কিছুতেই আর ফিরে যাব না। ভগবানের যা ইচ্ছে তাই হবে। এইরকম ভাবতে ভাবতে কালীচরণকে বললাম: 'তুমি আমার জন্যে যা ভালো বোঝো তাই করো। আমি খাল কেটে কুমির এনেছি, নিজের বিপদ নিজেই ডেকে এনেছি। আমি একটা আস্ত বোকাহাঁদা—না হলে লোকে যা বলে তা-ই বিশ্বাস করতে হয়! ভেবেছিলাম, বড়ো বড়ো নামি লোকের মদতে লেখাপড়া শিখে আমি একটা কেউকেটা হয়ে উঠব। এখন বুঝছি, সেসব আকাশকুসুম কল্পনা। কিন্তু আমাকে তো টিকে থাকার জন্যে কিছু-না-কিছু করতেই হবে।' কালীচরণ বলল: 'তুমি অতশত ছাইপাঁশ ভেবো না তো। আমার মাস্টারমশায় ব্রাহ্ম—খুবই দয়ালু মানুষ। দেখো, তিনি তোমার সব দুঃখকষ্টের জ্বালা-যন্ত্রণা জুড়িয়ে দেবেন। তাঁকে আমি তোমার সব কথা বলব। আমি আমার আর-এক বন্ধুকেও ডেকেছি, দেখি সে কী বলে। ওর সঙ্গে কথাবার্তা সেরে তবেই আমি ঢাকায় রওনা দেব।'

এসব শুনেটুনে আমার বুকে একটু বাড়তি বল এল। গোটা দিনটা কেটে গেল। বিকেলে এক ভদ্রলোক এলেন দেখা করতে। ছিপছিপে চেহারার, পরনে একটা ছাপা কাপড়ের জোব্বা। চলনে-বলনে কোনোরকম জাঁক দেখানো নেই; এমন একটা মর্যাদাময় চেহারা যে দেখলেই শ্রদ্ধায় মাথা নুইয়ে আসে। আমি তাঁর পা ছুঁয়ে প্রণাম করতে গেলে তিনি একপাশে সরে গেলেন। কালীচরণ বলল: 'ওঁর নাম মহেশচন্দ্র ভট্টাচার্য, কুমিল্লার মানুষ। খুবই দয়ালু, দেখো, উনি তোমার বিপদে ঠিক পাশে এসে দাঁড়াবেন। তবে উনি তো একা মানুষ, বউ নেই; না হলে থাকার জন্যে তোমার আর অন্য কোনো জায়গার কথা ভাবতে হত না।' মহেশচন্দ্র ভট্টাচার্য ঘাড় নেড়ে বললেন: 'ঠিক কথা। আমাদের দেশে গুরুদয়াল সিংহ নামে একজন আছেন, যিনি অনেক নিরাশ্রয় নারীকে আশ্রয় দেওয়ার বন্দোবস্ত করেন। আমি ওঁকে লিখছি আর আজই সব ব্যবস্থা করে ফেলছি। তুমি স্বর্ণর সঙ্গে ঢাকায় চলে যাও। ওখান থেকেই আমি তোমাকে গুরুদয়ালবাবুর বাড়িতে নিয়ে যাব।' আমি ভাবলাম: 'মানুষটি তো পেশায় একজন দালাল। মেজদির একশো টাকাটা এখনও আমার কাছেই আছে। মেজদি যে বালা কিনতে বলেছিল, সেটা কিনে ওঁর হাত দিয়ে পাঠিয়ে দিলেই তো হয়। নানা ঝক্কি-ঝঞ্ঝাটের মধ্যেই তো আছি; কখন কী হয় বলা তো যায় না। যদি টাকাটা কোনোভাবে খরচ করে ফেলি, তাহলে শোধ দেব কী করে?' আমার ভাবনার কথাটা মহেশবাবুকে জানালাম। কালীচরণও আমার

*দুর্গামোহন দাশ ও শিবনাথ শাস্ত্রী ১৮৮৮-র এপ্রিলে ইংল্যান্ড যাত্রা করেন।

কথায় সায় দিল। টাকাটা মহেশবাবুকে দিয়ে দিলাম। পরের দিন পঁচানব্বই টাকা দিয়ে মহেশবাবু সুন্দর একজোড়া বালা কিনে আনলেন। তাঁকে কোনো বানি (গয়না তৈরির মজুরি) দিতে হয়নি, কেবল সোনার দামেই তিনি কারও থেকে একজোড়া আনকোরা নতুন বালা কিনে এনেছেন। আমাকে রসিদও দেখালেন। তিনি বালাজোড়া মোড়কবন্দি করে বিমাকৃত পার্শেলে পাঠিয়ে দিলেন। কালীচরণকে বললেন: 'বোঝাই যাচ্ছে মেয়েটি অত্যন্ত সৎ। না হলে ওর কাছে পরের টাকা জমা আছে—ওকে যেন বিছেয় কামড়াচ্ছে! অন্য কোনো মেয়ে হলে ওই টাকা ফেরতই দিত না।' এরপর মহেশবাবু আমাকে বললেন: 'যাও, এখনকার মতো স্বর্ণর পরিবারে গিয়ে থাকো। আমি একটা পাকাপাকি বন্দোবস্ত করে তোমাকে খবর দিচ্ছি।'

সেদিনই রাতের ট্রেনে আমি ঢাকা রওনা দিলাম। মাথার ভেতর একরাশ ভাবনা কেমন জট পাকিয়ে যাচ্ছিল। সকালে একটা স্টিমারে চড়লাম। আমার জন্যে একটা কামরায় একটা বার্থের ব্যবস্থা হল। আর একটি ফুটফুটে সুন্দর মেয়ে বসেছিল সেখানে। তার পরনে জামা, পায়ে জুতো। কিন্তু মুখে তার হাসি নেই, একটা কথাও নেই। দেখে মনে হয় যেন মেঘে ঢাকা চাঁদ। ওর সঙ্গে কথা কইতে আমার মনটা কেমন ছটফট করছিল। অনেকবার খুঁচিয়ে খুঁচিয়ে জিগেস করাতে জানা গেল, ও শশীপদবাবুর* বিধবা-আশ্রমের আবাসিক ছিল। এখন বাবু শরৎচন্দ্র বসু ওকে সঙ্গে করে নিয়ে ঢাকার একজন ব্রাহ্ম জালাল মিয়ার** বাড়িতে নিয়ে যাচ্ছেন। আমি নাছোড়বান্দার মতো ওকে জিগেস করতে লাগলাম, ও যে বিধবা আশ্রমে থাকত সেখানে বাড়তি কারও জায়গা জুটবে কিনা। আমার প্রশ্ন শুনে ও ভয়ে শিউরে উঠল। বলল: 'সাবধান! ওখানে যাওয়ার কথা মনের কোনাতেও ঠাঁই দেবে না।' আমি তাকে আমার দশাটা কী তা গড়গড় করে বলে ফেললাম। তারা সব শুনল। তারপর বলল: 'ওখানে গিয়ে থাকার চেয়ে তুমি ভিক্ষে করে খাও সেও ভালো। ওইখানেই তো আমার চরম সর্বনাশটা ঘটে গেছে।' আমি জিগেস করলাম: 'কী হয়েছে তোমার, বোন?' ও বলল: 'চোখের মাথা খেয়েছ নাকি? দেখতে পাচ্ছ না?' আমি দেখলাম, ওর পেটটা বেশ ফোলা, বললাম: 'ওঃ! তোমার কী স্বামী নেই, তাই?' ও জবাব দিল: 'আচ্ছা, স্বামী থাকলে আমি বিধবা-আশ্রমে যাব কেন বলো তো? ওখানে যে কেউ আমাকে পাখির পালক দিয়ে মেরে পেড়ে ফেলতে পারত।' আমি জিগেস করলাম: 'ওখানে কি পুরুষমানুষ থাকে নাকি?' তারা বলল: 'ওটা তো ওদের নিজেদেরই বাড়ি।' তারার গলা ধরে এল, আর নিজেকে সামলাতে পারল না, ভেঙে পড়ল কান্নায়। কান্না ভেজা গলাতেই বলে চলল: 'শশীবাবুর বড়ো ছেলে আমাকে বিয়ে করতে চেয়েছিল; কিন্তু তার মা-বাবা তা কোনোমতেই হতে দেবেন না। তারপর যা হওয়ার ছিল তাই ঘটল। কারও একগাছি কেশও উড়ল না, আমিই তলিয়ে গেলাম রসাতলে। কে জানে, এখন জীবন আবার আমাকে কোন ঘাটে নিয়ে ভেড়াবে? আমি তো এখন বিপদ-সাগরে হাবুডুবু খাচ্ছি। শরৎবাবু আমাকে কোথাও একটা নিয়ে যাচ্ছেন। সেখানে হয়তো বাকি জীবনটা আমার লোকের দয়ার ওপর বেঁচে থাকতে হবে। এমন বেহাল অবস্থায় কি আমাকে পড়তে হত, যদি আমি ব্রাহ্মসমাজের কোনো একজনের মেয়ে হতাম? কেউ আমাকে এক কণাও দরদ দেখায়নি; কারও চোখেমুখে আমার জন্যে মমতার ছিটেফোঁটাও নজরে পড়েনি। এক অসহায় বিধবা, আমি বুকে বিরাট আশা নিয়ে যোগ দিয়েছিলাম তাদের করুণা-ভরা আদর্শের টানে। সেই বাড়ি এখন আমাকে ছেড়ে যেতে হচ্ছে কড়ায়-গণ্ডায় তাঁদের হিসেব চুকিয়ে, আমার মান-ইজ্জত সর্বস্ব খুইয়ে। কার হাত ধরব? কাকে ভরসা করব?—তিনকুলে আমার তো কেউ নেই। কেউ কি এই হতভাগীর দিকে মমতামাখা চোখে এক নজরও দেখবে? কেন? আমার একারই দোষ? আর ওই মানুষটি—তার গায়ে তো একটা আঁচড়ও লাগেনি; কেউ তাকে লম্পট-দুশ্চরিত্র বলে গালিও দেয়নি—চরিত্রে কালি ছেটানো তো দূরের কথা। আমাকে ছুঁড়ে ফেলা হল কেন? কেননা আমার বাবা ব্রাহ্ম নন। তারা একবারও ভাবল না আমার দশাটা কী হতে চলেছে। আমি দেখতে মোটেই কুৎসিত নই যে তারা তাদের হিরের টুকরো ছেলের জন্যে আমাকে নাকচ করে দিতে পারবে। আমার একমাত্র পাপ: আমি বিধবা। অথচ বাড়ির কর্ত্রী যখন ফের বিয়ে করেন তখন নিজেই ছিলেন একজন বিধবা। বিধবার ফের বিয়ে করাতে দোষের তো কিছু নেই। কী আর বলব আমি? ওরা তো আমার জীবনটাকে তছনছ করে ছেড়ে দিল। এই চরম দুর্দশা থেকে উদ্ধার পাওয়ার কোনো উপায় কি আমার আছে? বুক-ভরা জ্বালা যন্ত্রণা নিয়ে হারা-উদ্দেশ্যে ভেসে চলেছি একটা মাথা-গোঁজার ঠাঁইয়ের আশায়।'

তারার সব কথা শুনে আর ওর ওরকম উগ্রচণ্ডা মেজাজ দেখে আমার মাথায় যেন বাজ ভেঙে পড়ল। চুপটি করে অনেকক্ষণ বসে থাকা মেয়েটি আমি খোঁচাতেই তার ভেতরের সব জ্বালা-যন্ত্রণা, রাগ,

---

*মনে হয় তারা এখানে অতি বিখ্যাত ব্রাহ্ম সংস্কারক শশীপদ ব্যানার্জী-র (১৮৪০-১৯২৫) কথা বলছেন। তাঁর সংস্কার-কাজগুলোর মধ্যে ছিল: শ্রমিকদের জন্যে নৈশ বিদ্যালয়, একটা সেভিংস ব্যাঙ্ক, মেয়েদের জন্যে একটি বিদ্যালয় (একেবারে গোড়ার দিকে), নারীদের জন্যে একটি চলমান পাঠাগার ও 'অন্তঃপুর' নামে একটি নারীদের পত্রিকা, যা কেবল নারীদের লেখাই ছাপত। তাঁর প্রথম স্ত্রী গত হওয়ার পরে তিনি একজন বিধবাকে বিয়ে করেন ও অন্ততপক্ষে চল্লিশজন বিধবার বিয়ে দেন। পরবর্তীকালে তাঁর কাজকর্মের প্রভূত প্রশংসা হয় এবং তাঁর বিধবা-আশ্রমের কঠোর সংযম ব্রতর ওপর নানা জনে নানা কথা লিখে গেছেন। তাঁর বড়ো ছেলের নাম অ্যালবিয়ন রাজকুমার ব্যানার্জী। তাঁর আরও চারটি ছেলে ছিল। তারার কাহিনি বা হেম যে এই শশীপদ ব্যানার্জীর কথাই বলছেন—তা যাচাই করার কোনো উপায় নেই।

**জালাল মিয়া বা জালালউদ্দিন মিয়া ছিলেন ঢাকার একমাত্র সুপরিচিত মুসলমান, যিনি ব্রাহ্মধর্ম গ্রহণ করেছিলেন।

দুঃখকষ্ট সব যেন আমার সামনে উগড়ে দিল। আর হাজার বার করে আমাকে মানা করে দিতে লাগল: আমি যেন মরে গেলেও বিধবা-আশ্রমে না যাই। 'নামেই বিধবা-আশ্রম। লেখাপড়া শেখার কোনো বালাই-ই নেই। গিন্নির একটি ছেলে, নাম সত্য। তার একটাই কাজ—মেয়েগুলোকে ফোঁসলানো। আমি তোমাকে বারণ করে দিচ্ছি ওখানে যাওয়ার কথা কক্ষনো তুমি মনেও আনবে না। দেখতেই তো পাচ্ছ, কী দকে আমি পড়েছি। ও অবশ্য আমাকে বিয়ে করার জন্যে চেষ্টার কোনো কসুর করেনি, কিন্তু কর্তা-গিন্নি তাকে এই কাজটা কিছুতেই করতে দেয়নি। শেষমেশ তাঁরা বলে বসলেন: ''তুমি যদি তারা-কে বিয়ে করো তাহলে আমাদের থেকে এক কানাকড়িও পাবে না।'' আমি কর্তার পায়ে পড়ে গিয়ে কাঁদতে শুরু করলাম। গিন্নিকে কতই না কাকুতি-মিনতি করলাম—কিন্তু কিছুতেই তাঁদের মন টলল না। বোন, সত্যি করে বলো তো, সত্যর যদি একটুও মনের জোর থাকত তাহলে কি এভাবে আমাকে আস্তাকুঁড়ে ছুঁড়ে ফেলে দিতে পারত? আমরা দু-জনেই খাওয়া-পরা জোটানোর জন্যে একসঙ্গে কাজ করতে পারতাম। যাকগে, যা হবার তা হয়েছে। আমি এখন যে অশেষ দুর্গতির মধ্যে দিয়ে চলেছি, ভগবান নিশ্চয়ই একদিন তার শোধ তুলবেন। আমার মনে আর কোনো শান্তির আশা নেই। এখন কেবল ঈশ্বরই ভরসা।'

বুকের ভেতর থেকে তারা-র জন্যে দরদ আমার উপচে পড়ছে। আঁচল দিয়ে চোখের জল মুছিয়ে ওকে সান্ত্বনা দিতে লাগলাম, বললাম: 'আমিও তোমার মতো হতভাগী মেয়ে, যাকে দেখার মতো কেউ নেই। আমার যদি বিন্দুমাত্র উপায় থাকত, আমি তোমায় বুক দিয়ে আগলে রাখতাম। কিন্তু আমি নিজেই তো জানি না, কোথায় যাব আমি? তবে তোমার থেকে আজ অনেক কিছু জানলাম, শিখলাম। আমি আর কোনোদিনও সরল মনে এ-পৃথিবীর মানুষজনকে বিশ্বাস করতে পারব না।' তারা বলল: 'একদম ঠিক বলেছ, বোন। কাউকেই বিশ্বাস করা যায় না। "ভালোবাসা" একটা কথার কথা—ওর কানাকড়িও দাম নেই। আমি সত্যকে প্রাণ দিয়ে ভালোবেসেছি। ওকে স্বামী হিসেবে মেনেছি, শ্রদ্ধা করেছি। অথচ দ্যাখো, আমি যখন চলে আসছি, ও একবারটির জন্য আমার সঙ্গে দেখা করতে আসেনি। আমি যদি ওর অবস্থায় পড়তাম, আমি কি এরকম নিস্পৃহ, উদাসীন থাকতে পারতাম? ছুটে চলে যেতাম রাস্তায়। শেষবারের মতো আমাকে দেখার জন্যে ও কি কোনো চেষ্টা করেছে—করেনি।' এইসব বলতে বলতে তারা অঝোরে কেঁদেই চলেছে। তারা-র এই মারণ ইহযন্ত্রণায় আমি যেন ভেতর-ভেতর ভেঙে পড়ছিলাম। কীই-বা করব আমি? কী দিয়ে ওকে সান্ত্বনা দেব?

অনেকক্ষণ ট্রেনের কামরায় থেকে ইঞ্জিনের ধোঁয়ায় গা-হাত-পায়ে কালিঝুলি মাখা। চান করে সাফ হওয়ার দরকার। ওকে নিয়ে দ্বিতীয় শ্রেণির বাথরুমে গেলাম। চান করলাম প্রাণভরে। এসব বন্দোবস্তই অবশ্য করে দিয়েছিল কালীচরণ। সে এসে জিগেস করল: 'কী খাবে তুমি?' বললাম: 'কী খাওয়াবে শুনি! যা দেবে তাই খাব।' ও বলল: 'আমি ডাল, ভাত, আলুসেদ্ধ আর আলুভাজা আনতে বলে দিয়েছি।' বললাম: 'বাঃ! বেশ ভালোই ব্যবস্থা করেছ, দেখতে পাচ্ছি। তা এখানকার হেঁশেলটা কোথায়? আমরা নিজেরা সেখানে যেতে পারি না?' কালীচরণ বলল: 'না, তা হবে না। ওরাই খাবার এখানে বয়ে নিয়ে আসবে।' 'কে নিয়ে আসবে? বামুন রাঁধুনি?' 'হ্যাঁ, হ্যাঁ, তোমাদের খাবার বয়ে নিয়ে আসার জন্যে শুদ্ধ বামুন রাঁধুনি এখানে বসে আছে কিনা! খাবার বয়ে নিয়ে আসবে খানসামা (বেয়ারা বা রাঁধুনি, এঁরা সাধারণত মুসলমান)।' 'খানসামা কী?' কালী বলল: 'ওরা এখানে খাবার পরিবেশন করে। এর বেশি আমি কিছু জানি না।' আমি ভাবলাম,

তারাকে আমার ভাতের অর্ধেক আর ডাল, আলুসেদ্ধ দিয়ে দিলাম। এই অবর্ণনীয় দুঃখকষ্ট তার মুখে যেন কালশিটে পড়ে গেছে। ও বলল: 'জান তো বোন, গত চার-পাঁচদিন আমার কপালে ভাত জোটেনি। আজ কি আমাকে ভাত খেতেই হবে?'

শব্দটার মানে বোধ হয়—যে চাকর-বাকর খাবার পরিবেশন করে। যাহোক, কিছুক্ষণ পরে কালীচরণ নিজেই থালা ভর্তি ডাল, ভাত আর আলুসেদ্ধ নিয়ে এল। তারার জন্য ভেতরে পুর ভরা চারখানা কচুরি নিয়ে আসা হল। মনে হয়, শরৎবাবুর হাত দিয়ে তেমন জল গলে না। আমি তারাকে আমার ভাতের অর্ধেক আর ডাল, আলুসেদ্ধ দিয়ে দিলাম। এই অবর্ণনীয় দুঃখকষ্ট তার মুখে যেন কালশিটে পড়ে গেছে। ও বলল: 'জান তো বোন, গত চার-পাঁচদিন আমার কপালে ভাত জোটেনি। আজ কি আমাকে ভাত খেতেই হবে?' আমি জোর করে তার মুখে ভাতের দলা তুলে দিলাম। খেতে খেতে তার চোখ দিয়ে জল গড়িয়ে পড়ছিল: 'বোন, আমার জন্যে তো কারও একটুও মায়ামমতা নেই। আমি ঘোর পাপীতাপী সেজন্যে ব্রাহ্মরা আমার দিকে মুখ ফিরিয়েও দেখে না। সকলে আমাকে ঘেন্না করে; আমার সঙ্গে কদর্য ব্যবহার করে। তোমার কেন বোন আমার জন্যে এত মমতা? এসব তো আমার পাওয়ার কথা নয়।' আমি বললাম: 'দ্যাখো তারা! মানুষ কখনো তার স্বভাব বদলাতে পারে না। আমি নিজেই একটা হতভাগী; সেজন্যে তোমার দুর্গতি আমার মনের ভেতর বড়ো বেদনার মতো বেজেছে। আর সেজন্যেই তোমার দিকে আমার টানও বেড়েছে। দয়া করে আমাকে ফিরিয়ে দিও না। যতক্ষণ একসঙ্গে আছি, তোমার মনে যাতে কিছুটা শান্তি আসে, সে চেষ্টা আমি করব। আমার দু-জনেই এক

গোয়ালের গোরু, দু-জনেই হতভাগী। আর সেজন্যেই তোমার জন্যে আমার দরদ। কিন্তু বোন আমি তো অসহায়; তোমার জন্যে এর বেশি আমি আর কী করতে পারি? জন্মলগ্ন থেকেই আমি অভিশপ্ত, আর সেজন্যে পরের ভরসাতেই আমার দিন কাটে।'

তারা বলল: 'বোন, অবরে-সবরে যদি সময় পাও, আমার কথা একটু ভেবো। আর কিছুক্ষণের মধ্যেই আমরা নারায়ণগঞ্জ পৌঁছে যাব। আমাদের কার যে কী গতি হবে তার কোনো ঠিকঠিকানা নেই।' যাত্রীরা তাদের লটবহর গোছগাছ করতে শুরু করে দিয়েছে। বুঝলাম, এবার আমাদের একে অন্যেকে ছেড়ে যেতে হবে। আমি তারার উচাটন মনকে নানাভাবে শান্ত করার চেষ্টা করতে লাগলাম। স্টিমার জেটির গায়ে এসে লাগল। শরৎবাবু এসে তারাকে ডাকলেন। তারা উঠে দাঁড়িয়ে বলল: 'এবার আমাকে যেতে দাও, বোন। জানি না, আর কোনোদিন তোমার সঙ্গে দেখা হবে কিনা।' এই বলে সে চলে গেল।

আমি ওখানে বসে বসে ওর কথাই ভাবছিলাম আর বিষম ধন্দে আমার হতভম্ব দশা। না বললেও চলে ভেতরটা আমার গভীর বেদনায় আচ্ছন্ন হয়েছিল। ভাবছিলাম: 'পোড়াকপাল আমাদের! সব সমাজেই নারীরা এভাবেই নির্যাতন-নিগ্রহের শিকার হয়। এসব আটকাবে কে? এই মেয়েটাকে দেখে সকলেরই যেন ঘেন্নায় গা রি রি করে উঠেছে। আর ওকে দূর দূর করে তাড়িয়ে দিয়েছে। কিন্তু কেন? ওই ছোকরাটাকে কেউ তো বাড়ি থেকে বার করে দেয়নি? এমন ঘোর অবিচার কেন? নারীদের এইসব অন্যায়, জুলুম, অত্যাচার সইতেই হয়। না সয়ে তাদের উপায় নেই কোনো, কেননা তারা মোটেই স্বাধীন নয়।' কালীচরণ এসে বলল: 'এসো, এসো, নৌকো লেগে গেছে।' আমি উঠে ওর সঙ্গে নৌকোয় চড়ে বসলাম। ও বলল: 'একটুক্ষণ নৌকোয় বোসো তুমি, আমি কিছু দরকারি জিনিস কেনাকাটা করে আসছি।' ও দাঁড়িদের একজনকে সঙ্গে নিয়ে বাজারে চলে গেল। বাজার থেকে চাল, নুন, সবজি—এইসব নিয়ে এল। জিগেস করলাম: 'এই নৌকোয় কতদিন আমাদের থাকতে হবে?' ও বলল: 'শুধু আজ রাতটা। কাল বিকেল নাগাদই পৌঁছে যাব।' 'আমরা যাচ্ছি কোথায়?' কালীচরণ বলল: 'কোথায় আবার! আমাদের বাড়িতে। মহেশবাবু যতদিন না আসছেন, ততদিন তুমি আমাদের বাড়িতেই থাকবে।'

একথা শুনে আমি চুপ করে রইলাম। কালীচরণ জিগেস করল: 'ও, ভালো কথা, তুমি রান্নাবান্না করতে জানো তো? আমার তো মনে হয়, জানো।' আমি ঘাড় নাড়লাম। নৌকো নদীপথে চলতে শুরু করল। কিছু দূর যেতে না যেতে সূর্য ঢলে পড়ল পশ্চিমে। ঘনিয়ে এল সন্ধ্যার অন্ধকার।

আমাদের নৌকো একটা খুব বড়ো নদীর ওপর দিয়ে চলছিল। কালীচরণ বলল: 'মাঝি, তোমাদের চুলাটা একটু দাও তো, আমরা রাঁধব।' মাঝি জাতে জেলে। আমাদের জন্যে একটা উনুন আর ঘষেমেজে চকচকে করা একটা বড়ো পাত্র নিয়ে এল। আমি চুলায় আগুন ধরিয়ে ভাত বসিয়ে দিলাম। নৌকোয় তিনজন মাঝি; কিন্তু আমি যা চাল-ডাল-আলু নিয়েছি তা দিয়ে মেরেকেটে মাত্র দু-জনার মতো কুলিয়ে যেতে পারে। এই সময়ে কালী অন্য একটা জেলের নৌকো থেকে কয়েকটা মাছ নিয়ে এল। আমি মনে মনে ভাবলাম: 'আজ সকালেই তো বিধবার শুদ্ধ রীত-আচার ভেঙে আমি আমার জাত খুইয়েছি। সে কি আর ফিরে পাওয়া যাবে? তাহলে অকারণে 'কেষ্টর জীব'কে কষ্ট দিয়ে না খেয়ে থাকার দরকারটা কী? স্টিমারে মুসলমান খানসামার রান্না মুসলমান বাবুর্চির হাতে আমি খেয়েছি। আমি যে শুদ্ধ বৈধব্য-রীতি মেনে চলছিলাম, তার তো ওখানেই সাড়ে-সর্বনাশ ঘটে গেল। ওসব কূটকাচালি ভেবে আর হবেটা কী?' ভাত হয়ে গেছে। রাতও হয়েছে। আমি মাছের ঝোল রাঁধলাম। সঙ্গে একটা ছোটো পাত্রে কিছু মাছভাজা। কোনোমতে রান্না সেরে কালীকে বললাম—খাবার তৈরি। কালীচরণ জিগেস করল: 'ও মাঝিভাইরা, তোমাদের কোথায় খেতে দেব বলো তো?' 'ঠাকুর, আগে আপনারা খেয়ে নিন; পরে বামুনের ছোঁয়ায় শুদ্ধ পাক-করা রান্না খেয়ে আমাদের পুণ্য সঞ্চয় হবে। কালীচরণ তার খাবার খেয়ে নিল। আমি কলাপাতায় কিছুটা খাবার রেখে বাকিটা মাঝিদের দিয়ে দিলাম। ওরা নৌকোর নোঙর ফেলে খেতে শুরু করল।

আমি নৌকোর এক কোনে গুঁড়িশুঁড়ি মেরে পড়ে রইলাম। কালী শুয়ে পড়ল নৌকোর মাঝখানে। মাঝিরা সারারাত দাঁড় টেনে চলল। আমার ঘুম আসছিল না। ভাবছিলাম, তারার আর আমার কপালপোড়া দশার কথা। ভোরের দিকে একটু ঘুমিয়ে পড়েছিলাম। জেগে উঠলাম লোকের কথায়। শুনলাম: 'মালিক, অন্তত আটটা পয়সা দাও, চার পয়সায় কি এত মাছ হয় গো, বাবু!' আমি ভয়ে ভয়ে উঠে বসে দেখি, কালী বেতের আধ-টুকরি মাছ কিনছে মাত্র ছ-পয়সা দিয়ে। আমি সত্যিই খুব অবাক হয়ে গেলাম। মাত্র ছ-পয়সায় এত মাছ বিক্রি করে জেলেদের দিন-গুজরান হয় কী করে? ওই ছ-পয়সার মাছ কেটেকুটে, ধুয়ে পরিষ্কার করতে আমার গোটা সকালটা লেগে গেল! আমি চুলো জ্বালিয়ে মাছের সরষে-ঝাল, ঝোল আর অম্বল রাঁধলাম। পুব বাংলার লোকেরা প্রচুর পরিমাণে মাছ খায়। বাংলার অন্যান্য জায়গার লোকেরা তাদের সঙ্গে পাল্লা দিয়ে পারে না। আমি খুব সামান্য পরিমাণে মাছ খেলাম। কেননা ততদিনে মাছ না-খেয়ে-খেয়ে আমার মাছ খাওয়ার রুচি চলে গেছে। বাকিটা মাঝিরাই খেল। ওদের মুখচোখ দেখে মনে হল, রান্নাটা ওদের কাছে তেমন জমেনি; মনে হয় ওদের জিভের স্বাদ অনুযায়ী ঝাল কম পড়ে গিয়েছিল। খাওয়ার পর আমি ঘুমিয়ে পড়লাম। (চলবে) স্বাস্থ্যের বৃত্তে

লেখক একজন প্রাবন্ধিক ও অভিধানকার।

গায়ে ঘামের দুর্গন্ধ

ডা. জয়ন্ত দাস

একটি ১৭ বছরের মেয়ে আত্মহত্যা করতে গিয়েছিল। তার প্রিয় বন্ধুটি বলেছিল, বসিস না এখানে, বসিস না আমার পাশে। মেয়েটি জানত বন্ধুটির না-বসতে বলার কারণ, কেননা ওই ১৭-তেই সে জেনে গেছিল তার ভবিষ্যৎ অন্ধকার, তার গায়ে নাকি ভয়ানক দুর্গন্ধ। যদিও মেয়েদের চাইতে ছেলেদের গায়ে দুর্গন্ধ হবার সম্ভাবনা বেশি, তবু এখনও পর্যন্ত কোনো ছেলে এই সমস্যায় আত্মহত্যা করতে চেয়েছে এমন শুনিনি। কারণটা বোধ হয় সমাজ মেয়েদের শরীর দিয়ে যাচাই যতটা করে, ছেলেদের ততটা করে না।

অবশ্য ডাক্তারি পড়ানোর পাঠক্রম যদি দেখেন, আপনার মনে হবে গায়ে দুর্গন্ধ সমস্যাটির অস্তিত্ব নেই। এ-নিয়ে কোনোদিন ডাক্তারি পরীক্ষায় প্রশ্ন আসেনি, অন্তত এমবিবিএস পরীক্ষাতে আসেনি। কোনো কোনো বিষয়ের স্পেশালিস্ট হতে গিয়ে, এমডি করতে গিয়ে অবশ্য এই সমস্যাটা নিয়ে পড়তে হয়, তবে সেখানেও এটা বিশেষ গুরুত্ব পায় না। ফলে যে ডাক্তার এইসব রোগী দেখেন তিনিও রোগীর মতোই অসহায় বোধ করেন, এদিক-সেদিক হাতড়ে 'সর্বগন্ধহর' কোনো ওষুধ খোঁজেন, কিন্তু তেমন জিনিস এখনও বিজ্ঞান বানাতে পারেনি।

কতটুকু কী জানতে ও করতে পেরেছে বিজ্ঞান, সেটুকুই দেখি।

এমনিতে মানুষের শরীর থেকে তেমন দুর্গন্ধ বেরোনোর কথা নয়, এক যদি না সে মলমূত্র মেখে থাকে, বা দিনের পর দিন স্নান না করে। দুর্গন্ধ তাহলে হয় কোথা থেকে?

আমাদের দেহে দু-রকম ঘামের গ্রন্থি আছে। সাধারণ (এক্রিন) ঘামের গ্রন্থির কাজ হল শরীরের তাপমাত্রা কমিয়ে রাখা। আমরা কে না জানি, গরমে ঘাম হয়, আর সেই ঘাম বাষ্পীভূত হয়ে শরীরকে ঠান্ডা রাখে। মানুষের ক্ষেত্রে সেই ঘাম মূলত এক্রিন ঘামের গ্রন্থি থেকে বের হওয়া ঘাম।

এছাড়া আছে অ্যাপোক্রিন ঘর্মগ্রন্থি। মানুষের শরীরে এই দ্বিতীয় ধরনের ঘর্মগ্রন্থির আলাদা কাজ তেমন নেই। মনে করা হয় মানুষের পূর্বসূরি প্রাণীদের দেহে এই গ্রন্থিগুলো যৌনকর্মে বিপরীত লিঙ্গের প্রাণীটিকে আহ্বানের রাসায়নিক সংকেত পাঠাত। এরকম রাসায়নিকের নাম ফ্রিয়োমোন। মানুষের শারীরিক প্রক্রিয়াতে ফ্রিয়োমোন-এর ভূমিকা অপ্রমাণিত।

অ্যাপোক্রিন ঘর্মগ্রন্থি আকারে এক্রিন গ্রন্থির চাইতে বড়ো, কিন্তু সংখ্যায় অনেক কম। এক্রিন গ্রন্থি দেহের সর্বত্র থাকে। অ্যাপোক্রিন ঘর্মগ্রন্থি থাকে বগলে, স্তনবৃন্তের কাছে, পায়ু ও যৌনাঙ্গের আশপাশে, ও মুখের কিছু জায়গায়। আরেকটা কথা হল, কানের 'খোল' হয় যে গ্রন্থি থেকে সেটা একরকম পরিবর্তিত অ্যাপোক্রিন গ্রন্থি, এমনকী নারীর দুধ তৈরি করে যে স্তন, তাও আরেকরকম পরিবর্তিত অ্যাপোক্রিন গ্রন্থি। কিন্তু সাধারণভাবে অ্যাপোক্রিন গ্রন্থি নিয়ে এখন যে আলোচনা করব তাতে এই পরিবর্তিত অ্যাপোক্রিন গ্রন্থিগুলোকে হিসেবে ধরব না।

এক্রিন ঘর্মগ্রন্থি ছোটো ও সরল, তার থেকে যে ঘাম বের হয়, তাও সরল, মোটামুটি লবণ ও জল দিয়ে তৈরি। সাধারণভাবে এ থেকে দুর্গন্ধ হয় না। তাই আমরা দেখি, অনেকে খুব বেশি ঘামেন, কিন্তু ঘামে দুর্গন্ধ সহজে হয় না। তবে ব্যতিক্রম আছে—যেমন রসুন খেলে এই ঘামে দুর্গন্ধ হয়, কিছু কিছু ওষুধ খেলেও হতে পারে; কোন ওষুধ, সে-ব্যাপারে পরে আবার বলব। আমাদের দেশে আর্সেনিকের মহামারি চলছে, আর এক্রিন ঘামে দুর্গন্ধযুক্ত আর্সেনিক যৌগ নিঃসৃত হয়, ফলে আর্সেনিক-বিষণে আক্রান্তদের ঘামে এই কারণে দুর্গন্ধ হতে পারে। আবার যাদের হাত ও পায়ের চেটো খুব বেশি ঘামে, জুতোমোজা পরার ফলে সেই ঘাম জমে, জীবাণু সংক্রমণ হয়ে দুর্গন্ধ হয়।

অ্যাপোক্রিন ঘর্মগ্রন্থি চেহারায় বড়ো ও জটিল, তার নিঃসরণও অত সরল নয়। এতে যেমন রসুন বা ওষুধ দেহ থেকে বেরোতে পারে, ও

তার জন্য দুর্গন্ধ হতে পারে, তেমনই এই ঘামের নিজস্ব রাসায়নিক থেকে দুর্গন্ধ হতে পারে। অ্যাপোক্রিন ঘামে বেশ কিছু রাসায়নিক বেরোয় যাদের নিজস্ব দুর্গন্ধ নেই বটে, কিন্তু ত্বকের নানা জীবাণু এই রাসায়নিকগুলো হজম করে দুর্গন্ধযুক্ত ফ্যাটি অ্যাসিড নির্গত করে। গায়ে দুর্গন্ধের প্রায় সব ক্ষেত্রে এটাই মূল কারণ। আর যেহেতু যতক্ষণ জীবাণুরা অ্যাপোক্রিন ঘামকে হজম না করছে ততক্ষণ দুর্গন্ধ বেরোয় না, সেহেতু ত্বক থেকে অ্যাপোক্রিন ঘাম দ্রুত সরিয়ে ফেলতে পারলে এরকম দুর্গন্ধ হবে না।

অ্যাপোক্রিন ঘর্মগ্রন্থি বয়ঃপ্রাপ্তির আগে অকেজো থাকে। সেটা স্বাভাবিক, কারণ মানুষের পূর্বসূরি প্রাণীদের দেহে এই গ্রন্থিগুলো যৌনকর্মে সাহায্য করত। ফলে শৈশবে এদের কাজ শুরু হবার কথা নয়। আর এই জন্যই দেখা যায় শিশুদের শরীরে ঘামের দুর্গন্ধ হয় না।

সবার শরীরে কিন্তু ঘামের দুর্গন্ধ সমান হয় না। ওষুধ, আর্সেনিক বিষণ, রসুন খাওয়া এসব কারণ না থাকলে, যাদের শরীরে ঘামের দুর্গন্ধ বেশি তাদের অ্যাপোক্রিন গ্রন্থির গড় আকার বড়ো, তাদের সংখ্যা বেশি, আর তারা ঘাম তৈরি করে বেশি পরিমাণে। এদের অ্যাপোক্রিন গ্রন্থিতে পুরুষ হরমোন টেস্টোস্টেরন বিশেষ কারণে (5 alfa reductase নামক উৎসেচকের প্রভাবে) বেশি ক্রিয়াশীল; আর অ্যাপোক্রিন গ্রন্থি টেস্টোস্টেরন দ্বারা উত্তেজিত হয়ে বেশি নিঃসরণ করে।

এই মূল কারণটিকে কেমন করে নিয়ন্ত্রণ করে ঘামের দুর্গন্ধ কমানো যায় সেটা বলার আগে বলে নেওয়া দরকার, ঘামে দুর্গন্ধ হলে, অন্তত বাংলায়, দেখুন আপনি আর্সেনিক-প্রবণ এলাকায় আছে কিনা—নলকূপের জল খেলে সেটা পরীক্ষা করান। আর্সেনিক কিন্তু বড়ো এক বিপদ, তা থেকে ক্যান্সার পর্যন্ত হতে পারে। এছাড়া রসুন খাওয়া বাদ দিন। ঝালমশলা ও মাংস, বিশেষ করে রেড মিট খাওয়া কমান, কেননা তা থেকেও দুর্গন্ধ হতে পারে। কোনো ওষুধ খেলে, দেখুন ওষুধ খাবার আগে ও পরে ঘামের দুর্গন্ধ কমা-বাড়া হয়েছে কিনা; এমন হলে ডাক্তারের কাছে গিয়ে বলুন। ওষুধের মধ্যে বিশেষ করে মানসিক অসুস্থতার ওষুধ অ্যান্টি-ডিপ্রেস্যান্ট থেকে ঘামে দুর্গন্ধ হতে পারে, আর এটা একটা জটিল পরিস্থিতির সৃষ্টি করতে পারে। কেননা, মানসিকভাবে অসুস্থ রোগী অনেক সময় নিজের শরীরে নানা খারাপ জিনিস আবিষ্কার করেন, এবং নিজের ঘামে দুর্গন্ধ হচ্ছে, এটা তাঁর ভুল ধারণাও হতে পারে। তাঁর চিকিৎসা কিন্তু অনেক সময় ওই অ্যান্টি-ডিপ্রেস্যান্ট ওষুধ-ই। তাই ডাক্তারকেই এ-ব্যাপারে সিদ্ধান্ত নিতে দিন।

কিছু কিছু রোগ বাড়াবাড়ি স্তরে গেলে গায়ে বিশেষ ধরনের গন্ধ হতে পারে, যেমন ডায়াবেটিস, কিডনি বা বৃক্কের রোগ, গেঁটেবাত (গাউট)। টাইফয়েডের রোগীর দেহেও একরকম গন্ধ হয়, অনেক চর্মরোগে গায়ে গন্ধ হয়, কিন্তু সেগুলোর ক্ষেত্রে ডাক্তাররা রোগটি এমনিতেও চিকিৎসা করেন ও গন্ধ তাতেই চলে যায়, সুতরাং এসব নিয়ে এখানে আলোচনা করছি না।

ঘামের দুর্গন্ধর চিকিৎসা

এসব কারণ না থাকলে, সাধারণভাবে ঘামের দুর্গন্ধর চিকিৎসা হল এইরকম।

☞ প্রতিদিন ভালোভাবে স্নান করুন। গরমের দিনে অন্তত দু-বার স্নান করুন। ভিজে গামছায় গা মুছুন, বিশেষ করে বগল, পায়ু-যৌনাঙ্গ অঞ্চল, মুখ, বুক। ঘাম গায়ে জমতে না পারলে জীবাণু তা থেকে দুর্গন্ধ তৈরির সময় পাবে না। বগল, পায়ু-যৌনাঙ্গ অঞ্চলে জীবাণুনাশক সাবান ব্যবহার করুন (সাধারণভাবে সারা গায়ে জীবাণুনাশক সাবান নানা কারণে ব্যবহার না করাই ভালো, বিশেষ করে যদি দুর্গন্ধের সমস্যা না থাকে)।

☞ জামা, বিশেষ করে গেঞ্জি আন্ডারওয়ার জাঙ্গিয়া প্যান্টি বদলান প্রতিদিন।

☞ সুতির জামাকাপড় পরুন, বিশেষ করে গেঞ্জি আন্ডারওয়ার ইত্যাদি।

☞ বগলের লোম কামিয়ে রাখুন।

☞ স্নান করা সম্ভব না হলে, আর্থিক সামর্থ্য থাকলে, ডিওডোর‍্যান্ট বা ঘাম কমানোর স্প্রে ইত্যাদি লাগান।

☞ অনেকের হাত-পা খুব ঘামে। সেটা কিন্তু অ্যাপোক্রিন ঘাম নয়, এক্রিন ঘাম, ফলে সহজে দুর্গন্ধ হবার কথা নয়। কিন্তু পায়ে সারাদিন জুতোমোজা পরে থাকলে ব্যাকটিরিয়া ও ছত্রাক সংক্রমণ হয়ে যায়, তা থেকে দুর্গন্ধ হয়। এর চিকিৎসা হল পা-হাত খোলা রাখার চেষ্টা ও ডাক্তারের পরামর্শমাফিক জীবাণুনাশকের ব্যবহার।

অপারেশন, বোটুলিনাম টক্সিন ইত্যাদি

অন্য কিছুতে কাজ না হলে, ছোটো একটা অপারেশন করে বগলের কিছুটা চামড়া বাদ দিয়ে মূল সমস্যার হেতু কিছু অ্যাপোক্রিন গ্রন্থির হাত থেকে স্থায়ী রেহাই পাওয়া যেতে পারে। আর বেশি ঘাম হলে সেটা কমানোর জন্য সংবেদী স্নায়ুকে বাদ দেওয়া খুব অল্প ক্ষেত্রে করা হতে পারে।

বোটুলিনাম টক্সিন তার বাণিজ্যিক নাম বোটক্স হিসেবে বেশি পরিচিত। এতে চামড়ার মধ্যে ইঞ্জেকশন দিয়ে কয়েক মাসের মতো সেই জায়গার ঘাম খুব কমানো সম্ভব, ইঞ্জেকশনটি খরচসাপেক্ষ, ও বারবার দিতে হয়।

ঋণস্বীকার: ব্রিটিশ ন্যাশনাল হেলথ সার্ভিস-এর জনশিক্ষামূলক ওয়েবসাইট https://www.nhs.uk/conditions/body-odour/থেকে কিছু উপাদান ২২ আগস্ট ২০১৮ তারিখে নেওয়া হয়েছে। স্বাস্থ্যের বৃত্তে

ডা. জয়ন্ত দাস, এমবিবিএস, এমডি, চর্মরোগ বিশেষজ্ঞ, প্রাইভেট প্র্যাকটিস করেন।

নিশ্বাসে ও মুখে দুর্গন্ধ

ডা. জয়ন্ত দাস

নিশ্বাসে দুর্গন্ধ আর মুখে দুর্গন্ধ নিয়ে খুব আতান্তরে পড়েন রোগীরা। দাঁতের ডাক্তারবাবুরা অনেক দেখে-টেখে হয়তো সার্টিফিকেট দিয়ে দেন—আপনার মুখ-দাঁত-মাড়ী সব ঠিক আছে। কিন্তু দুর্গন্ধ যায় না। সামাজিকভাবে লজ্জায় পড়ে যান এঁরা, কেউ কেউ শিকার হন ডিপ্রেশনের। আবার কেউ-বা মেয়েবন্ধু / ছেলেবন্ধুর কাছে আড়ষ্ট হয়ে যান লজ্জায় আর সংকোচে। এঁদের কোনো উপায় আছে কি?

নিশ্বাসে ও মুখে দুর্গন্ধের কারণ

দাঁত আর মাড়ীর রোগই হল অধিকাংশ রোগীর সমস্যার কারণ। মুখের মধ্যে জীবাণু (ব্যাকটিরিয়া) থাকে, আর আপনি যে খাবার খান তা খেয়েই এরা বেঁচে থাকে, বংশবৃদ্ধি করে। খাবারের কণাগুলো হজম করার সময় ব্যাকটিরিয়া নানারকম দুর্গন্ধযুক্ত গ্যাস নির্গত করে। মুখের মধ্যে যদি বেশি খাবারের কণা জমে থাকে তো এদের বাড়াবাড়ি বৃদ্ধি ঘটে, আর দুর্গন্ধ হয়। দাঁতের ফাঁকে খাবার জমা ছাড়া মাড়ীর রোগে মুখগহ্বরের জীবাণু বাড়ে, তারা আপনার খাদ্য খায়, আপনার মাড়ীর কোশকলাও খায়, আর দুর্গন্ধযুক্ত গ্যাস ছাড়ে।

এছাড়া রসুন, পেঁয়াজ ইত্যাদি খেলে সাময়িকভাবে মুখে দুর্গন্ধ হয়, সারাদিন এসব খেলে দুর্গন্ধ স্থায়ী হয়ে যায়। আর বিড়ি-সিগারেট খেলেও দুর্গন্ধ হয়, দুর্গন্ধ হয় মদপান করলেও। বিড়ি-সিগারেট-মদ খেলে, মাড়ী ও দাঁতের ক্ষতি হবার সম্ভাবনা বাড়ে, আর তার ফলে স্থায়ী দুর্গন্ধ হতে পারে।

দাঁতের ফাঁকে, দাঁত আর মাড়ীর সংযোগস্থলে, দাঁতের পেছনে ব্যাকটিরিয়া বাসা বাঁধে। এছাড়া মাড়ীতে আর জিভেও ব্যাকটিরিয়া থাকে। এরা দাঁতের ক্ষয় ঘটায়, আমরা চলতি কথায় বলি দাঁতে পোকা লাগা। আবার এরা মাড়ীর রোগও ঘটায়—মাড়ী ফুলে যায়, ব্যথা করে, রক্ত বেরোতে পারে।

মুখের ব্যাকটিরিয়ার হাত থেকে রক্ষা পাবার উপায় বিড়ি-সিগারেট না খাওয়া ও মুখ পরিষ্কার রাখা। মুখ পরিষ্কার রাখতে দাঁত মাজার প্রয়োজন আমরা কমবেশি সবাই বুঝি। কিন্তু 'ডেন্টাল ফ্লস' ব্যাপারটা তুলনায় অজানা ও অপ্রচলিত শব্দ। দাঁতের ফাঁকে ঢুকে থাকা খাদ্যকণা সাধারণ দাঁত মাজার ফলে পুরো দূর হয় না, বিশেষ করে যাদের দাঁতের মধ্যে ফাঁক থাকে তাঁদের ক্ষেত্রে অনেকটা খাদ্যকণা এই ফাঁকে ঢুকে

চিত্র ১. প্ল্যাস্টিকের কাঠির একদিকে টুথপিক, অন্যদিকে ছোটো ধনুকের জ্যা আকৃতির ডেন্টাল ফ্লস করার সুতো

থাকতে পারে, ও ব্যাকটিরিয়ার খাদ্য হতে পারে। দাঁত-খোঁচানো কাঠি বা টুথপিক দিয়ে আমরা এই দাঁতের ফাঁকে ঢোকা খাবার পরিষ্কার করার চেষ্টা করি—কিন্তু তাতে সমস্যা হল যে মাড়ীতে চোট লাগতে পারে, আর সব জায়গায় এই টুথপিক ঢোকে না। 'ফ্লস' হল একটুকরো শক্ত সরু সুতো, যেটার দুই প্রান্ত দুই আঙুলে জড়িয়ে ধরে, মাঝখানটা

দাঁতের ফাঁকে ঢুকিয়ে দাঁতের ফাঁক খুব ভালোভাবে পরিষ্কার করা যায়। এভাবে পরিষ্কার করা একটু সময়সাপেক্ষ, আর প্রথমদিকে এর কৌশল শিখতে খানিক অসুবিধা হতে পারে। আজকাল প্ল্যাস্টিকের কাঠির একদিকে টুথপিক, অন্যদিকে খানিকটা ছোটো ধনুকের আকৃতির সুতো-লাগানো ডেন্টাল ফ্লস বাজারে পাওয়া যায়—এটা দিয়ে খুব সহজে দাঁতের ফাঁক পরিষ্কার করা যেতে পারে।

দাঁত আর মাড়ী পরিষ্কার করার জন্য টুথব্রাশ-টুথপেস্ট, আর ডেন্টাল ফ্লস নিয়মিত ব্যবহার করে অধিকাংশ ক্ষেত্রে মুখের দুর্গন্ধ থেকে রেহাই পাওয়া যায়। তবে জিভের ওপর-নীচেও ব্যাকটিরিয়া জমে, বিশেষ করে জিভের ওপরে খসখসে জায়গায়। সেই জায়গাটাও নিয়মিত ধুয়ে ও নরম ব্রাশ দিয়ে ঘষে পরিষ্কার করে রাখতে হবে।

উন্নত দেশে বলা হয়, সমস্যা থাকুক আর না থাকুক, আপনাকে নির্দিষ্ট সময় অন্তর দাঁতের ডাক্তারের কাছে গিয়ে চেক-আপ করাতে হবে। আমাদের দেশে সবাই এটা পারবেন না, কিন্তু মুখে দুর্গন্ধ হলে, বা দাঁতে ব্যথা জাতীয় কোনো সমস্যা হলে দাঁতের ডাক্তার দেখাতে হবে, আর তাঁর কাছ থেকে জেনে নিতে হবে মুখের সামগ্রিক যত্ন কেমন করে করবেন—তাঁর কথাগুলো কিন্তু মেনে চলার দায় আপনারই। সময়ে চিকিৎসা করলে দাঁত ও মাড়ীর সমস্যাগুলো সহজে সারে, আর স্থায়ী ক্ষতি হবার সম্ভাবনা কমে।

খাওয়া-দাওয়া, ধূমপান, মদ, ডায়েটিং, ওষুধ

পেঁয়াজ-রসুন ছাড়াও বেশি মশলাদার খাবার খেলে কিছুক্ষণ মুখে গন্ধ থাকে। কফি খেলে মুখে একরকম গন্ধ হয়। তবে চা বা কফি খেয়ে মুখ ধোবার চল আমাদের মধ্যে তেমন নেই, কিন্তু ওগুলোতে দুধ বা চিনি দেবার ফলে সেই দুধ-চিনি মুখের ভেতর লেগে থাকে, আর তা খেতে ব্যাকটিরিয়া আসে, ও দুর্গন্ধযুক্ত গ্যাস ছাড়ে। তাই চা খান বা কোল্ড ড্রিঙ্ক বা কফি কোকো হেলথ ড্রিঙ্ক, তারপর ভালো করে মুখ ধুয়ে নেবেন।

ধূমপান সরাসরি মুখে দুর্গন্ধ বাড়ায়। তা ছাড়া ধূমপায়ীদের সহজে দাঁত ও মাড়ীর রোগ হয়। মুখে দুর্গন্ধ হলে, ধূমপান ছাড়ুন, সেটা অনেক চিকিৎসা-ওষুধ-ডাক্তার দেখানো থেকে বাঁচাবে।

মদ খেলে সঙ্গে সঙ্গে মুখে যে দুর্গন্ধ হয় সেটা সবাই জানি। এছাড়া মদ খেয়ে মুখ না-ধোবার ফলে ব্যাকটিরিয়া সংক্রমণ হয়ে দুর্গন্ধ হতে পারে। আর বেশি মদ যারা খান তাঁরা প্রায়শই নিজের মুখের ভেতরে যত্ন নেন না—ফলে দুর্গন্ধ হয়।

ক্র্যাশ ডায়েটিং, অর্থাৎ খুব তাড়াতাড়ি ওজন কমানোর জন্য বাড়াবাড়ি রকমের খাওয়া কমানো—তাতে দেহের চর্বি ভেঙে শরীর দৈনন্দিন প্রয়োজনের শক্তি জোগাড় করে। এর ফলে 'কিটোন' নামক যে যৌগ তৈরি হয় তা কিছুটা নিশ্বাসে বেরোয়, তার একটা দুর্গন্ধ আছে।

এছাড়া কিছু ওষুধে নিশ্বাসে দুর্গন্ধ হতে পারে। যেমন হার্টের রোগের বুকে ব্যথা কমাতে যে নাইট্রেট ওষুধ দেওয়া হয় তাতে, ক্যান্সারে কেমোথেরাপির কিছু ওষুধে, আর ফেনোথায়াজিন গোত্রের ঘুমের ওষুধে। ওষুধ খাবার পর নিশ্বাসে দুর্গন্ধ হলে আপনার ডাক্তারের সঙ্গে কথা বলুন।

শরীরের ভেতরকার অসুখ থেকে মুখে দুর্গন্ধ

এটা খুব বেশি দেখা যায় না। তবে যারা নাকের বদলে কেবল মুখ দিয়ে শ্বাস নেন, তাঁদের মুখে দুর্গন্ধ হতে পারে। অনেকের কিছু রোগের ফলে মুখে লালা নিঃসরণ কমে যায়, তাঁদের মুখে দুর্গন্ধ হয়। অনিয়ন্ত্রিত ডায়াবেটিস, ফুসফুসের অসুখ, নাক-গলার সংক্রমণে নিশ্বাসে দুর্গন্ধ হয়। যেমন টনসিলাইটিস, সাইনুসাইটিস (সাইনাসের অসুখ),

ছোটো বা মাঝারি সাইজের নরম টুথব্রাশ ব্যবহার করুন। দু-তিনমাস অন্তর টুথব্রাশ বদলান। . . . একবার দাঁত মাজার জন্য অন্তত দু-মিনিট সময় দিন। . . . ফ্রুট জুস, কোলা, কমলালেবু জাতীয় টক ফল ইত্যাদি খাবার পরে আধঘণ্টার মধ্যে দাঁত মাজবেন না, তাতে দাঁতের ক্ষয় বেশি হয়।

ব্রঙ্কাইটিস, ব্রঙ্কিয়েকটেসিস—এসব রোগে নিশ্বাসে দুর্গন্ধ হয়। তেমনই অম্বল-বুকজ্বালা রোগে যখন গ্রাসনালী (ইসোফেগাস)-র তলার দিকটায় প্রদাহ হয়, বা পাকস্থলীতে এইচ পাইলোরি ব্যাকটিরিয়ার সংক্রমণ হয়, তখনও মুখে ও শ্বাসে কমবেশি দুর্গন্ধ হতে পারে। তবে এসব রোগ হলে কাশি, জ্বর, শ্বাসকষ্ট, গলাজ্বালা, পেটব্যথা ইত্যাদি নিয়ে রোগীরা এমনিতেই ডাক্তার দেখান, আর রোগটার চিকিৎসা ঠিকমতো হলে রোগ সারার সঙ্গে সঙ্গে দুর্গন্ধও চলে যায়।

দুর্গন্ধভীতি বা হ্যালিটোফোবিয়া

মুখে দুর্গন্ধকে ডাক্তারি পরিভাষায় বলে 'হ্যালিটোসিস' (halitosis)। আর 'ফোবিয়া' কথাটার অর্থ হল ভীতি বা আতঙ্ক। দুর্গন্ধভীতি বা হ্যালিটোফোবিয়ায় আক্রান্ত মানুষের মুখে বা শ্বাসে দুর্গন্ধ থাকে না, কিন্তু এঁরা এক অনড় ধারণার বশবর্তী থাকেন যে তাঁদের ওরকম দুর্গন্ধ আছে। অন্যদের যেকোনো ব্যবহার থেকে তাঁরা ধরে নেন যে তাঁদের রোগের জন্যই এমন হচ্ছে—যদি কোনো বন্ধু তাঁদের সঙ্গে কথা বলার সময় তাড়াহুড়ো করেন তো তাঁরা ভাবেন, আমার মুখ থেকে দুর্গন্ধ বেরোচ্ছে, তাই বন্ধু আমার কাছাকাছি টিকতে পারছে না। এটা মানসিক

রোগ। আর মানসিক রোগের মতো করেই এর চিকিৎসা করতে হয়।

দাঁত পরিষ্কার রাখার উপায়

যেহেতু দাঁতের আর মাড়ীর সমস্যা থেকেই অধিকাংশ ক্ষেত্রে মুখে ও নিশ্বাসে দুর্গন্ধ হয়, তাই এ ব্যাপারটা আরেকবার বলা দরকার।

➢ ছোটো বা মাঝারি সাইজের নরম টুথব্রাশ ব্যবহার করুন। দু-তিনমাস অন্তর টুথব্রাশ বদলান।

➢ একবার দাঁত মাজার জন্য অন্তত দু-মিনিট সময় দিন। খাবার পরে মুখ ধুয়ে দাঁত মাজা দরকার, তাই আপনার সঙ্গে (বা স্কুলে ও অফিসে) টুথব্রাশ-পেস্ট রাখুন।

➢ দাঁত মাজার সময় দাঁত ও মাড়ীর সমস্ত দিকগুলো যেন পরিষ্কার করা হয় সেটা খেয়াল রাখুন; বিশেষ করে দাঁত আর মাড়ীর সংযোগস্থল ও দাঁতের পেছনদিক যেন বাদ না পড়ে।

➢ নরম টুথব্রাশ বা নরম জিভছোলা দিয়ে আস্তে আস্তে জিভের ওপরটা পরিষ্কার করুন।

➢ ফ্রুট জুস, কোলা, কমলালেবু জাতীয় টক ফল ইত্যাদি খাবার পরে আধঘণ্টার মধ্যে দাঁত মাজবেন না, তাতে দাঁতের ক্ষয় বেশি হয়। দাঁতের ডাক্তার হয়তো আপনাকে অ্যান্টি-ব্যাকটিরিয়াল মাউথওয়াশ ব্যবহার করতে বলতে পারেন। ডাক্তার যতদিন বলেছেন তার বেশিদিন সেটা ব্যবহার করবেন না, আর মনে রাখবেন মাউথওয়াশ কিন্তু দাঁতমাজার বিকল্প নয়।

নকল দাঁত

যাঁরা নকল দাঁত ব্যবহার করেন তাঁরা রাত্রে নকল দাঁত খুলে শোবেন, সকালে সেই দাঁত সাবানজল বা নকল-দাঁত ধোবার ক্রিম দিয়ে পরিষ্কার করে পরে নেবেন; নকল দাঁত ধোয়ার জন্য টুথপেস্ট ব্যবহার করবেন না, কিন্তু একটা আলাদা টুথব্রাশ ব্যবহার করলে ভালো হয়।

আপনার মুখে কি দুর্গন্ধ আছে?

আপনার মুখে দুর্গন্ধ আছে কিনা সহজে পরীক্ষা করে দেখুন। আপনার কবজির ভেতরদিকটা ধুয়ে পরিষ্কার করে আপনার জিভের পেছনদিক দিয়ে চাটুন বা ঘষুন। কয়েক সেকেন্ড পরে, লালাটা শুকিয়ে গেলে, জায়গাটা শুঁকুন। দুর্গন্ধ লাগছে কি? যদি লাগে, তবে আপনার মুখে ও শ্বাসে দুর্গন্ধ থাকার কথা। আর যদি না লাগে, আপনি খামোকা এ নিয়ে বেশি দুশ্চিন্তা করবেন না। স্বাস্থ্যের বৃত্তে

এই লেখাটি লিখতে বিশেষ সাহায্য নেওয়া হয়েছে ব্রিটেনের ন্যাশনাল হেলথ সার্ভিস-এর স্বাস্থ্যশিক্ষা সংক্রান্ত ওয়েবসাইট-এ (https://www.nhs.uk/conditions/bad-breath)।

ডা. জয়ন্ত দাস, এমবিবিএস, এমডি, চর্মরোগ বিশেষজ্ঞ।

Advt.

ধর্ম-জাতপাত-অযুক্তি-কর্তৃত্ব ও কুসংস্কারের বিরুদ্ধে দাঁড়িয়ে আপনার যুক্তিবাদী মননচর্চার দীর্ঘদিনের সাথী

একুশ শতকের যুক্তিবাদী

একুশ শতাব্দীর যুক্তিবাদী

ভারতীয় বিজ্ঞান ও যুক্তিবাদী সমিতির কেন্দ্রীয় মুখপত্র

৩১, প্রাণকৃষ্ণ সাহা লেন, বরানগর, কলকাতা - ৭০০ ০৩৬

যোগাযোগ ঃ ৯৮৩৬৪৭৭১৯৫, ৯৮৩০৬৭৩৫১২

এছাড়া কমবয়সীদের জন্য আছে আকর্ষণীয় গল্প-ফিচার-ছবিতে ঠাসা কিশোর যুক্তিবাদী

এডিস ইজিপ্‌টাই (Aedes Aegypti)

ডা. সমুদ্র সেনগুপ্ত

এই হল সেই মশা যারা ডেঙ্গু ছড়ায়। হাজার দুয়েক বছর আগে এডিস ইজিপ্‌টাই মিশরের সংলগ্ন বনভূমির মশা ছিল (সিলভ্যাটিক) স্বভাবে জুফিলিক মানে পশুর রক্তখেকো। এরপর দাবানলে জঙ্গল পুড়ে যায়। মরুভূমি হয়। তাই তখন মানুষের রক্ত খাওয়া শুরু করে ও অতি অল্প জলে ডিম পাড়ার অভ্যেস হয় (ম্যান মেড কন্টেনার)। ওই একই কারণে বাঙালির মতো ঘরকুনো (রেগে যাবেন না প্লিজ)। বেশি দূরে উড়ে যায় না। এই মশার ফ্লাইট রেঞ্জ ৩০০ থেকে ৫০০ মিটার। কারণ দু-একবার উড়ে দেখেছে যে মরুভূমিতে অতদূরে গিয়ে কামড়ানোর মতো মানুষ পায়নি। তাই ও বেটি পেরিডোমেস্টিক। তাই সাগর বা নদীর জল নিয়ে মাথা না ঘামিয়ে বাড়ির ভেতরে বা আশেপাশে জমা পরিষ্কার জল-এর আধার বা পাত্র নিয়ে মাথা ঘামান।

জলাধার পাত্র কী কী ভাবে 'ধ্বংস' করা হবে?

১. পরিত্যক্ত মাটির পাত্র ভেঙে ফেলুন, ডাবের খোল টুকরো টুকরো করে দিন ; ২. ব্যবহার না করে ফেলে রাখা পাত্র উলটে দিন যাতে জল জমতে না পারে; ৩. ফেলে দেওয়া খালি থার্মোকল/প্লাস্টিকের পাত্র সরিয়ে ফেলে পুঁতে ফেলুন; ৪. ব্যবহার না করে ফেলে রাখা টায়ার ঢেকে রাখুন, ফুটো করে দিন যাতে জমা জল বেরিয়ে যায়; ৫. জল জমিয়ে রাখার চৌবাচ্চা, ড্রাম, ফ্রিজ, AC, কুলারের তলা, ফুলদানি, টবে জমাজল ফেলে দিন, পরিষ্কার করুন; ৬. Overhead Tank ঢেকে রাখুন; ৭. বন্ধ নর্দমা পরিষ্কার করুন/তেল ছড়িয়ে দিন; ৮. সেচখালের আগাছা পরিষ্কার করুন; ৯. ব্যবহার না করে ফেলে রাখা পাতকুয়াতে সাতদিন অন্তর তেল ছড়িয়ে দিন।

রোজ জল পরিষ্কার করতে হবে না। ডিম ফুটে পুরো মশা হয়ে উড়ে যাওয়ার জন্য দিন দশেক সময় লাগে। তাই সপ্তাহে এক দিন অন্তত জল পরিষ্কার অভিযান চালালেই হবে। ড্রাই ডে। তবে অন্য রকমের। এটা পালন করতে আমারও আপত্তি নেই। আশা করি আপনারও থাকবে না।

যারা ভাবছেন এত্ত সব ঝক্কি না পুইয়ে মশার ক্রিম মেখে বসে থাকব সারা গায়ে তাদের জন্য এট্টু বলি। এই ইজিপ্‌টাই ফ্রন্টাল অ্যাট্যাক পছন্দ করে না। এবং অতি নার্ভাস প্রকৃতির। মানুষকে মশা কামড়ালে স্বাভাবিক প্রতিবর্ত ক্রিয়াতে আমাদের হাত চলে। দাঁড়িয়ে থাকা অবস্থায় তো বটেই, এমনকী বসে থাকা অবস্থায়ও বেশিরভাগ

রোজ জল পরিষ্কার করতে হবে না। ডিম ফুটে পুরো মশা হয়ে উড়ে যাওয়ার জন্য দিন দশেক সময় লাগে। তাই সপ্তাহে এক দিন অন্তত জল পরিষ্কার অভিযান চালালেই হবে।

মানুষেরই হাত এত লম্বা হয় না যে গোড়ালির কাছাকাছি পায়ের অংশে হাত যাবে। তাই ওই তলার দিকের অংশে এরা বেশি কামড়াতে পছন্দ করে। তাই পুরো হাতা জামা প্যান্ট পরে শরীর ঢাকলে গরমে মারা গেলেও মশার কামড় থেকে কিছুটা বাঁচা যাবে।

মরুভূমিতে সেই সময়ে মানুষ বেশি চলাচল করত নিশ্চয়ই আমার আপনার মতো দশটা/পাঁচটা নয়। রোদের তেজ যখন কম থাকত। কারণ তখন রে-ব্যান-এর রোদ-চশমা বের হয়নি।

মানুষ বেরোত সকাল আর সন্ধ্যে। তাই বেটি এডিসও ভোরে সূর্যোদয়ের আধঘণ্টার মধ্যে এবং সন্ধ্যায় সূর্যাস্তের আধঘণ্টা আগে কামড়ায় সবচেয়ে বেশি। মোটামুটি দিনের বেলায়। দিনের বেলায়

যারা ঘুমোয় যেমন শিশু, বৃদ্ধ, গর্ভবতী মা, এদের সব্বাইকে তাই দিনের বেলাতেও মশারি খাটিয়ে ঘুমোতে হবে। আমার মতো লোক যারা সব সময়েই ঘুমোতে ভালোবাসে তাদেরও ওই মশারি চাই।

এরা নার্ভাস বাইটার। এজন্য সামান্য নাড়াচাড়া হলেই রক্ত খাওয়া অর্ধসমাপ্ত রেখে চাচা আপন প্রাণ বাঁচা নীতিতে উড়ে গিয়ে অন্য মানুষের গায়ে বসে। ওর পেট ভরার জন্য তাই একাধিক মানুষকে এক সিটিং-এ কামড়ায়। এবং সব্বার শরীরে ডেঙ্গু ভাইরাস দান করে। তাই একজন ডেঙ্গু রুগীর বাড়িতে বা আশেপাশের বাড়িগুলোতেই একাধিক ডেঙ্গু রুগী পাওয়া যায়। এদের তুলনায় অ্যানোফিলিস অনেক এফিশিয়েন্ট বাইটার। একজনের শরীর থেকেই পেট ভরে রক্ত খায়। এইজন্য জ্বরের রুগীকে সবসময় মশারির তলায় শোয়াবেন। এতে ওর আর কিছু উপকার হবে না। উপকারটা হবে আমার, আপনার। ওই রুগীর শরীর থেকে মশার মাধ্যমে আর ডেঙ্গু, ম্যালেরিয়া ছড়াবে না।

এই মশা দেখতে গাঢ় নীলাভ কালো রঙের, মশার সমস্ত শরীরে আছে সাদাসাদা ডোরাকাটা দাগ। আদরের ডাকনাম টাইগার মশা। হ্যাঁ, টাইগারই বটে। ঘরের অন্ধকারময় কোনাগুলোতে, আসবাবপত্র-এর তলায়, পর্দার পেছনে এই টাইগারবাবু লুকিয়ে থাকতে ভালোবাসেন।

এইবার একটু নারীবাদী আলোচনা হয়ে যাক। মশা কিন্তু এমনিতে

আপনাদের দেখানোর জন্য মাঝে মধ্যে মশা মারতে কামান দাগা হয়। কিন্তু কাজের কাজ? কয়েকটা মশা মারা যায়, কিছু পাইলে যায় বেপাড়ায়। তাই ওর চেয়ে ঢের ভালো হল মশা মারার তেল স্প্রে করা। আর তার চেয়েও ভালো জমা জল নষ্ট করা।

ভেজ। গাছপালা, ফলের রস এসব খেয়ে বেঁচে থাকে। কিন্তু গর্ভবতী স্ত্রী মশা তার ডিমগুলোকে বড়ো করার জন্য রক্ত খেতে বাধ্য হয়, পশু অথবা মানুষের রক্ত। এক্ষেত্রে স্ত্রী মশা ডেঙ্গু আক্রান্তর রক্তপান করে নিজে সংক্রমিত হয় ও পেটে ভাইরাস বহন করে। প্রায় ৮-১০ দিন পর ভাইরাস মশার দেহের অন্যান্য কোষে ছড়িয়ে পড়ে যার মধ্যে আছে মশার লালাগ্রন্থি এবং শেষে এর লালায় চলে আসে। ডেঙ্গু ভাইরাসে আক্রান্ত এডিস মশা যখন আরেকজন সুস্থ মানুষকে কামড় দেয় তখন সে ডেঙ্গুরোগে আক্রান্ত হয়। মজাটা এখানেই যে ভাইরাস শরীরে ঢুকলেও মশার কিন্তু ডেঙ্গু হয় না।

এই ভাইরাস ডিমের মধ্যে চলে যেতে পারে। ওই ডিম ফুটে তৈরি হওয়া সব এডিস-এর শরীরেই ভাইরাস পাওয়া যাবে। ডিমগুলো চটচটে আঠালো হয়। জল ছাড়া বছর খানেক বেঁচে থাকতে পারে। তাই জল ভরা বড়োসড়ো পাত্র, যেমন চৌবাচ্চা এর শুধু জল খালি করলেই হবে না, গাগুলো ঘষে ঘষে পরিষ্কার করে দিতে হবে।

ভাবছেন সবই যদি আমি করব তাহলে ব্যাটাচ্ছেলে সরকারটা কী করবে। মশার বাচ্চা (লার্ভা) যেগুলি জলে থাকে, সেগুলি মারতে মশা মারার তেল স্প্রে করবে সরকার। ওই লার্ভাগুলো জলের মধ্যে থাকে, খায়। আর নিশ্বাস নেবার নলটাকে জলতলের ওপরে বের করে দেয়। জলে তেলে মিশ খায় না। ভারী কোনো তেল যেমন ডিজেল ইত্যাদি যদি জলের ওপর ঢেলে দেওয়া যায়, তাহলে ঐ লার্ভাগুলো দম আটকিয়ে মারা যাবে।

ডানাওয়ালা মশা মানে অ্যাডাল্ট মশা মারা মুশকিল। চাঁদনির ফুটপাত থেকে সবাই একটা করে মশা মারার ব্যাট কিনব আর সকাল সন্ধে মশার পিছনে ছোটাছুটি করব এটা ভালো দেখাবে না। তাই আপনাদের দেখানোর জন্য মাঝে মধ্যে মশা মারতে কামান দাগা হয়। মশা মারার তেল দিয়ে ঘন কুয়াশার মতো ধোঁয়াতে চারদিক ঢেকে যায়। দারুণ দেখতে লাগে। কিন্তু কাজের কাজ? কয়েকটা মশা মারা

আমার, আপনার বাঁচার উপায়? কেন মশাই, কষ্ট করে এই লেখাটা যখন পড়েই ফেলেছেন, এবার নেমে যান কাজে। জমা জল সরানোর কাজে।

যায়, কিছু পাইলে যায় বেপাড়ায়। মানে এ পাড়ার মস্তান ও পাড়ায় গিয়ে মস্তানি করে। তাই ওর চেয়ে ঢের ভালো হল মশা মারার তেল স্প্রে করা। আর তার চেয়েও ভালো জমা জল নষ্ট করা।

এতটা যারা পড়ে ফেলেছেন তাদের নিশ্চয়ই মনে মনে নেতা হাতা -দের ওপর খুব রাগ হচ্ছে। দিল তো এতগুলো কাজ আমাদের ওপর চাপিয়ে। ও ব্যাটাদের ডেঙ্গু হয় না? আজ্ঞে সে গুড়ে বালি মশাই। সব ক-টা নেতা থাকে বহুতলে, বাংলায় যাকে বলে হাই-রাইজার। এই ইজিপ্টাই মশা আবার উদিকেও খুব একটা অ্যাডভেঞ্চারাস নয়। আলোর উৎস-এর দিকে উপরে উড়ে যেতে ভালোবাসে। বেশি উঁচুতে হাওয়ার (উইন্ড) টানেল থাকে, যার ধাক্কায় ছিটকে যাওয়ার সম্ভাবনা থাকে। ফলে বহুতল বাড়ির যত ওপরের তলায় থাকবেন সেখানে গিয়ে ওর ডিম পাড়ার প্রবৃত্তি তত কম। অতএব নেতাবাবুরা বেঁচে গেলেন। একতলা ঘরে আর আজকাল ক-জন নেতা থাকে বলুন।

আমার, আপনার বাঁচার উপায়? কেন মশাই, কষ্ট করে এই লেখাটা যখন পড়েই ফেলেছেন, এবার নেমে যান কাজে। জমা জল সরানোর কাজে।

অথ সমাপ্ত এডিস ইজিপ্টাই কথা। বাবা ইজিপ্ট তথা মিশর। ধন্য তুমি এমন মশার জন্ম দিয়েছে বলে! স্বাস্থ্যের বৃত্তে

ডা. সমুদ্র সেনগুপ্ত, এমবিবিএস, ডিপিএইচ, স্বাস্থ্য প্রশাসক।

প্ল্যান্টার ফাসাইটিস ও পায়ের তলায় ব্যথা

ডা. মৃন্ময়

অন্য পাঁচটা সাধারণ দিনের মতো সকাল থেকে ক্লিনিকে রোগী দেখে চলেছি। কিন্তু মেজাজটা গতকাল রাত থেকে বিগড়ে আছে। ভেতরে একটা চাপা ক্ষোভ। আর মাঝে মধ্যেই তা কাজে-কর্মে ফুটে উঠছে। বরাবর চেষ্টা করি যাতে আমার রাগ বা দুঃখ রোগী দেখাকে প্রভাবিত না করে। কিন্তু কী করব বলুন ডাক্তারাও তো আপনাদের মতোই রক্ত-মাংস-মন-মস্তিষ্কের মানুষ। যন্ত্রমানব নয়। তাই এসবও থাকে। আর তা কাজের ক্ষেত্রকেও প্রভাবিত করে, শত চেষ্টা করে দূরে রাখার চেষ্টা করলেও। আগের রাতেই আমার মেডিক্যাল কলেজের ভাই-বোনেদের শান্তিপূর্ণ অবস্থানের ওপর প্রিন্সিপ্যাল (স্যার কথাটা উচ্চারণ করতে পারলাম না। শিক্ষক বলতে আমি যা বুঝি তার সাথে ওনার কাজকর্ম মেলে না) পুলিশ আর শাসক দলের দেড়শো

ভদ্রমহিলা আমার কথায় খুব একটা সন্তুষ্ট হলেন না। পরক্ষণে ভাবলাম ওঁর আর দোষ কী। রোগীর এই আচরণের পেছনে ডাক্তারদের অবদান-বা কম কী।

ওগুন্ডাকে লেলিয়ে দিয়েছেন। তিন ভাই গুরুতর আহত হয়েছে। মনে পড়ে যাচ্ছিল ২০১১ সালের ছাত্রজীবনের ঘটনা। একই রকমের ঘটনা ১১২ জন ছাত্র-ছাত্রী-কে পুলিশ ও গুন্ডা দিয়ে জেলে পুরেছিল তখনকার প্রিন্সিপ্যাল । যাই হোক তা এই সব মাথার মধ্যে চরে বেড়াচ্ছে মাঝে মাঝেই। এমন সময় দিদি আমাকে রোগী দিল।

রোগের ইতিহাসের দিকে তাকিয়ে দেখি দু-মাস ধরে ডান গোড়ালি ব্যথা। চিকিৎসা করেও সারেনি। বছর পঞ্চাশেকের এক মহিলা প্রায় এক ব্যাগ ভর্তি কাগজপত্র নিয়ে ঢুকলেন। সঙ্গে বোরখা পরে বাড়ির একজন। দেখলেই বোঝা যায় উচ্চ-মধ্যবিত্ত পরিবারের। ব্যাগ ভর্তি ফাইল কাগজ মানে শেষ দু-মাস বিস্তর ঘোরাঘুরি করেছেন। রোগীর ইতিহাসপত্র খুলে দেখলাম রোগীর পারিবারিক আয় চব্বিশ হাজার টাকা। মানে আমার অনুমান ঠিক। ও, 'ইতিহাসপত্র' শুনে ভাবছেন-সে কী বস্তু, তাই তো? আসলে আমাদের ক্লিনিকে রোগী এলে স্বাস্থ্যকর্মীরা রোগীর ইতিহাস, রক্তচাপ, নাড়ির গতি, তাপমাত্রা, পরিবারের রোগের ইতিহাস নিয়ে একটি কাগজে নথিবদ্ধ করেন বাংলায়। এতে রোগীরা বুঝতে ও সময় নিয়ে বলতে পারেন আর ডাক্তারদেরও অনেকটা কাজ এগিয়ে থাকে। ওই কাগজটি হল 'ইতিহাসপত্র'।

তা যাই হোক। রোগী এসে বসলেন পাশের চেয়ারে। কাগজে দেখলাম ওজন লেখা ৭৫ কেজি। জিজ্ঞাসা করলাম—'কী অসুবিধে হয়েছে বলুন দেখি আর একবার।'

মহিলা কিছু না বলেই ওই ফাইল আর কাগজপত্র এগিয়ে দিলেন। আর আমি একটু অসন্তুষ্ট হয়ে বললাম—'আরে কাগজপত্র তো দেখব। আগে মানুষটাকে দেখি, কী অসুবিধে সেটা তো শুনি। হাতেনাতে যা পরীক্ষা করা যায় সে সব করি। তারপর না হয় রিপোর্ট আর অন্য প্রেসক্রিপশন দেখব।'

ভদ্রমহিলা আমার কথায় খুব একটা সন্তুষ্ট হলেন না। পরক্ষণে ভাবলাম ওঁর আর দোষ কী। রোগীর এই আচরণের পেছনে ডাক্তারদের অবদান-বা কম কী। যাই হোক ভদ্রমহিলা যা বললেন তার সারমর্ম হল—দু-মাস ধরে ডান পায়ের পাতার গোড়ালির দিকটা খুব ব্যথা। কোনো চোট লাগেনি। আস্তে আস্তে ব্যথা বেড়েছে। সবচেয়ে বেশি ব্যথা হয় সকালে ঘুম থেকে ওঠার পর পা মাটিতে ফেললে। তারপর আস্তে আস্তে ব্যথাটা খানিক কমে। অনেকক্ষণ বসে থাকার পর চলতে শুরু করলেও বেশ ব্যথা বাড়ে। সিঁড়ি দিয়ে ওঠার সময়ও ব্যথা হয়।

ব্যস, বুঝলাম আর রিপোর্ট দেখে কাজ নেই। ডায়াগনোসিস লিখে ফেললাম—প্ল্যান্টার ফাসাইটিস। কিন্তু এত রিপোর্ট নিয়ে এসেছেন, তাই ওঁর আশা ভঙ্গ না করেও বললাম—'দিন, রিপোর্টগুলো দেখে নিই, কিন্তু জানি গোড়ালির সমস্ত রিপোর্টই নর্মাল থাকবে।'

ভদ্রমহিলা বেশ অবাক হয়ে বললেন—'আপনি জানলেন কেমন করে?'

আমি রিপোর্ট দেখা শেষ করে অল্প হেসে বললাম—'আপনি যে পরীক্ষাগুলো করেছেন তা নর্মালই থাকে এই রোগে।'

আগে যে ডাক্তারদের দেখিয়েছেন তাঁদের প্রেসক্রিপশনগুলোর পাতা ওলটালাম। দেখলাম কাউকেই ভদ্রমহিলা এক সপ্তাহের বেশি সময় দেননি। ডাক্তার বদলাতে বদলাতে গেছেন। দেখলাম একটি মেডিক্যাল কলেজের অস্থিবিভাগের (অর্থোপেডিক্স) টিকিট। তাতে প্রথমে পায়ের এক্স-রে করার পরামর্শ দেওয়া ও পরে রিপোর্ট দেখে

ব্যথার ও অম্বলের ওষুধ দিয়ে 'ফিজিক্যাল মেডিসিন ও পুনর্বাসন বিভাগ'-এ রেফার করা। আপাতভাবে কোনো ভুল নেই। কিন্তু আমার অন্য কথা মনে পড়ে গেল।

ইন্টার্নশিপের সময় প্রথম যেদিন ডিউটি পড়ল অস্থিবিভাগে, বেশ উৎসাহ নিয়ে গেলাম আউটডোর-এ। দেখি শয়ে শয়ে রোগী লাইনে দাঁড়িয়ে।

পিজিটি-দাদা (মানে যিনি এমবিবিএস পাস করে অর্থোপেডিক্স-এ এমএস করছিলেন) ডেকে নিয়ে গিয়ে বললেন-'দেখ অপারেশনের কেস ছাড়া স্যাররা দেখেন না। অপারেশনের কেস পেলে আমাদের দেখাবি, আমরা স্যারদের সঙ্গে কথা বলে নেব। স্যাররা আলাদা রুমে বসেন। আর অপারেশনের কেস ছাড়া বাকি যা পাবি তাতে আইবুপ্রোফেন (ব্যথার ওষুধ), ফেমোটিডিন (অম্বলের ওষুধ) আর ক্যালশিয়াম-এর ট্যাবলেট দিবি। যেখানে ব্যথা সেখানকার এক্স-রে করাতে বলবি। দিয়ে ফিজিক্যাল মেডিসিন ও পুনর্বাসন বিভাগে রেফার করে দিবি। এর বাইরে বেশি কিছু জিজ্ঞেস করবি না। পাঁচ ঘণ্টায় কয়েক হাজার রোগী দেখতে হবে আমাদের। বুঝতে পারলি।' আমি তো থ! আমি ইন্টার্নি, মানে শিক্ষানবিশ ডাক্তার। কোথায় কী শিখব বলুন তো? কিন্তু কীই-বা করা, ওই যে পাঁচ ঘণ্টায় হাজার রোগী দেখা! স্বয়ং ধন্বন্তরিও ফেল মেরে যাবেন সত্যিকারে চিকিৎসা করতে গেলে। ওই কয়দিন, অতএব, ওটাই করেছি। পরে ফিজিক্যাল মেডিসিন ও পুনর্বাসন বিভাগে কিছুদিন কাজ করার সুবাদে বুঝেছি, আমাকে, মানে অস্থিবিভাগের ডাক্তারদের, বেশ গালি দিয়েছেন ফিজিক্যাল মেডিসিন-এর ডাক্তাররা। একজন রোগীকে ঠিক করে ব্যায়াম দেখাতে কম করে পনেরো মিনিট সময় লাগার কথা। আর মেডিক্যাল কলেজে তখন ছয় জন লোক ফিজিক্যাল মেডিসিন-এ। আর আমরা রেফার করি প্রত্যেক দিন কম করে ছয় থেকে সাত-শো রোগী। জানি না সমস্ত রোগী দেখা হত কিনা, কিন্তু আমাদের মনে মনে গালি পাড়তেন ফিজিক্যাল মেডিসিনের ডাক্তাররা, এটা নিশ্চিত।

সে যাই হোক, ফিরে আসি এই ভদ্রমহিলার গোড়ালি ব্যথার কথায়। তাঁকে ছবি এঁকে বোঝাতে শুরু করলাম—'পায়ের পাতায় চামড়ার নীচে তন্তুময় কলার একটি শক্ত আবরণী থাকে যা গোড়ালির হাড় থেকে আঙুলগুলোর গোড়া অব্দি বিস্তৃত। তাকে বলে প্ল্যান্টার ফাসা। মাংসের দোকানে দেখবেন, গোরু বা ছাগলের মাংস কেটে দেওয়ার আগে একটা ছুরি দিয়ে সাদা শক্ত চামড়ার মতো কিছু জিনিস বাদ দেয় পা ও পিঠের দিক থেকে। এটা ওই রকম একটা জিনিস। ঠিক চামড়ার নীচে আর মাংসপেশির বাইরের দিকে থাকে। বেশ কাজের জিনিস। পায়ের পাতার মাংশপেশিগুলোকে আঘাত থেকে বাঁচায়। আমাদের পায়ের পাতাটা ঠিক সমতল নয়, পা মাটিতে পেতে রাখলে মাঝখানটা খানিক উঁচু থাকে। সেটাকে বলে পায়ের পাতার খিলান, ইংরাজিতে প্ল্যান্টার আর্চ। এই প্ল্যান্টার ফাসা সেই আর্চ-কে নীচের দিক থেকে ধরে রাখতে সহযোগিতা করে। মানে একটু কাজ ভাগ করে নেয় আর কী। হাঁটা বা দৌড়োনোর সময় এই প্ল্যান্টার ফাসা পায়ের পাতার দিকে স্প্রিং-এর মতো কাজ করে, ফলে আমাদের পায়ে চাপ কম পড়ে। আপনার ওই প্ল্যান্টার ফাসা-তে প্রদাহ হয়েছে, বুঝলেন। ওকেই আমরা ডাক্তারিতে বলি "প্ল্যান্টার ফাসাইটিস"।

'তা না হয় বুঝলাম বাবা ফাসা-টাসা। কিন্তু বললে যে—"পায়ের আর্চ"। ওটা কেমন জিনিস? 'ব্যায়ামে আর্চ আছে জানি; ওই শরীরটা ধনুকের মতো বাঁকিয়ে দুই হাতের তালু মেঝেতে ফেলা। কিন্তু তা বলে পায়ে আর্চ হবে কেন? আমি তো ব্যায়াম করি না!'

'আরে না না ওরকম নয় ব্যাপারটা। উঠে দাঁড়ান। এরপর পায়ের পাতার ভেতরের দিকে তাকান। দেখুন পায়ের পাতা আর মাটির মাঝে ফাঁক আছে। আসলে পায়ের পাতা পুরো সমতল নয়। পায়ের হাড়গুলোও ওরকমভাবে সাজানো, অনেকটা ওলটানো তাওয়ার মতো। আগেকার দিনের দরজার ওপরে যেমন খিলান থাকত, অনেকটা সেরকম যেন। খিলান-কে ইংরেজিতে বলে আর্চ। এটাকে তাই বলে পায়ের খিলান, প্ল্যান্টার আর্চ।'

'কিন্তু এত ওষুধ খেয়েও তো সারছে না।'

বললাম—'ব্যথার ওষুধ খেয়ে যখন সারেনি, আর দেব না। আমাকে সাত দিন সময় দিন। আর তিনটে কথা বলব, সেগুলো মেনে চলুন।'

এক, এই হিল তোলা জুতো পরা বন্ধ করুন। নরম সোলের জুতো সবসময় পরে থাকুন। অল্প হিল মানে হাফ থেকে এক ইঞ্চি হিল হলে ভালো হয়। আর জুতোর সোল যেন পায়ের পাতার পরিপূরক হয়। মানে জুতোর সোলের গড়ন এমন হবে যাতে পায়ের পাতার আর্চকে পুরো সাপোর্ট দিতে পারে। বিছানা ছাড়া সব জায়গায় জুতো পরুন।'

দুই, দুটো গামলা নিয়ে একটাতে উষ্ণ গরম জল নিন আর অপরটাতে সাধারণ ঠান্ডা জল। প্রথমে গরম জলে চার মিনিট পা ডুবিয়ে রাখুন। পরে ঠান্ডা জলে এক মিনিট। এইরকম বার বার করুন। এভাবে আধ ঘণ্টা করে দিনে দু-বেলা।'

প্ল্যান্টার ফাসাইটিস

তিন, সাত দিন এখানে আসুন। মেশিনে করে সেঁক দেবেন আমাদের স্বাস্থ্যকর্মী। আল্ট্রাসাউন্ড থেরাপি।'

'সাত দিন টানা আসতে হবে?' ভদ্রমহিলা বিস্মিত ও করুণ মুখ করে বললেন।

আমারও সোজা উত্তর—'রোগ সারাতে গেলে সময় তো দিতেই হবে। তাই না।'

এতক্ষণ চুপ থাকার পর সঙ্গে আসা বোরখা পরা মহিলা বলে উঠলেন—'হ্যাঁ, আসবে। আমি নিয়ে আসব।' আমি আশ্বস্ত হলাম।

যেকোনো চিকিৎসার একটা গুরুত্বপূর্ণ দিক হল রোগী ও তাঁর বাড়ির লোককে রোগ সম্পর্কে জানানো। রোগের ফলাফল ও চিকিৎসা সম্পর্কে যতটা পারা যায় সহজ করে ওঁদের মতো করে বোঝানো। চিকিৎসা মানে কিন্তু কেবল রোগ আর ওষুধ নয়। তার বাইরেও অনেক দিক আছে। আর এই দিকগুলো দিনের পর দিন অবহেলিত হয়েছে। না, **এটা কারও একার দোষ নয়**। যে দেশে জনগণের সাপেক্ষে ডাক্তারের সংখ্যা অপ্রতুল, যেখানে বেশিরভাগ ডাক্তার শহরে বাস করেন, যে সরকারি ব্যবস্থায় একজন ডাক্তার একমিনিটও সময় পান না একজন রোগীকে দেখতে, সেখানে এমন আকাশকুসুম কল্পনা করা বেকার। আবার অনেক এমন ডাক্তারও আছেন যাঁরা এই বলার কাজটুকু করেন না, কারণ সেই সময় আর পাঁচটা রোগী দেখে জলদি কাজ শেষ করা যাবে আর বেশি লক্ষ্মীলাভ হবে। আবার অনেক ডাক্তারের কাছে ব্যাপারটা খানিকটা 'ল্যাদ-এর সমস্যা, মানে আগেকার লবজে বললে, স্রেফ কুঁড়েমি। কিন্তু বিশ্বাস করুন ডাক্তাররা এই কাজটুকু অল্পবিস্তর করলে রোগী ও তার পরিবারের 'গুগুল' আর 'বাজারি স্বাস্থ্য পত্রিকা' ও 'মিডিয়া হাউসের বিজ্ঞাপন' দেখে বিপথগামী হওয়ার সম্ভাবনা অল্প হলেও কমে। রোগীদেরও এটা জানার দায়িত্ব আছে। জিজ্ঞেস করুন ডাক্তারবাবুদের আপনার রোগ সম্পর্কে, তার চিকিৎসা সম্পর্কে। এ নিয়ে না হয় পরে বিস্তর আলোচনা করা যাবে। আজকের গল্পে ফিরি।

এরপর বোরখা পরা মহিলা জিজ্ঞেস করলেন—'আচ্ছা ডাক্তারবাবু মায়ের এটা কেন হল?'

'একদম ঠিক কোন কারণে আপনার মায়ের এটি হয়েছে তা সত্যি বলতে বুঝতে পারছি না। আসলে বেশিরভাগ ক্ষেত্রে ঠিক কী কারণে এটা হয় তা বোঝা যায় না। যেমন উচ্চ রক্তচাপ-এর কারণ বেশিরভাগ ক্ষেত্রে আমাদের অজানা, ঠিক তেমনি। আঘাত লেগে হতে পারে—কিন্তু আপনার মায়ের তো সেরকম কিছু ঘটেনি। কিছু কিছু মানুষের মধ্যে এই রোগ বেশি হয়। যেমন—চল্লিশ থেকে ষাট বয়সিদের, যাঁদের ওজন স্বাভাবিক-এর থেকে বেশি, যাঁরা নাচেন, যাঁরা দৌড়ান বা লাফানো কোনো খেলা খেলেন, যাঁদের পায়ের আর্চ স্বাভাবিক-এর থেকে বেশি বা কম (ফ্ল্যাট ফুট)—তাঁদের। এছাড়াও কিছু রোগে এর প্রকোপ বেশি দেখা যায়। যেমন, আঙ্কাইলোসিং স্পন্ডাইলোসিস,

বেশিরভাগ সময় নিজের থেকেই এই রোগ সেরে যায়। কেবল রোগের সময়কালে নরম সোলের সঠিক জুতোর ব্যবহার আর গোড়ালির ওপর যাতে চাপ কম পড়ে সেদিকে নজর রাখা জরুরি।

পারকিনসন ডিজিজ, যাঁদের টেন্ডো অ্যাকিলিস (গোড়ালির পেছনের উপরের দিকের টেন্ডন) এর দৈর্ঘ্য কম হয়। আর একটা বড়ো কারণ উলটোপালটা জুতো পরা। এই যে আপনার মা এরকম একখানা হিল দেওয়া শক্ত জুতো পরেন, সেই জুতোটা পায়ের যে স্বাভাবিক গড়ন আছে শরীরের সুবিধের জন্য, তার সঙ্গে খাপ খেয়ে পায়ের কাজের সুবিধা তো করছেই না, উলটে অসুবিধা করছে বেশি। এই জুতো আর বেশি ওজন এই দুটো কারণ হলেও হতে পারে।'

এরপর মহিলা ও তার মেয়েকে ফিজিওথেরাপির ঘরে পাঠিয়ে দিতে বললাম দিদিকে।

পরীক্ষানিরীক্ষা সম্পর্কে কিছু কথা: বেশিরভাগ ক্ষেত্রে কোনো পরীক্ষানিরীক্ষা করার প্রয়োজন পড়ে না। কিন্তু আঘাতজনিত কোনো কারণ থাকলে সেক্ষেত্রে এক্স-রে করতে হতে পারে। হাড়ে খুবই সূক্ষ্ম ফাটল সৃষ্টি হলে অনেক সময় এক্স-রেতে তা ধরা পড়ে না। সেক্ষেত্রে এমআরআই করার দরকার পড়ে। যে সমস্ত রোগ থাকলে প্ল্যান্টার ফাসাইটিস হওয়ার সম্ভাবনা বাড়ে সেগুলির জন্য যে সমস্ত পরীক্ষা করা দরকার তাও করতে হতে পারে, কিন্তু যদি সেরকম কোনো রোগের অন্য লক্ষণ থাকে। রোগের সঠিক ইতিহাস নেওয়া ও ডাক্তারের নিজহাতে পরীক্ষা করেই বেশিরভাগ ক্ষেত্রে এই রোগ নির্ণয় করা যায়।

কী কী চিকিৎসা করতে হতে পারে?

➢ বেশিরভাগ সময় নিজের থেকেই এই রোগ সেরে যায়। কেবল রোগের সময়কালে নরম সোলের সঠিক জুতোর ব্যবহার আর

গোড়ালির ওপর যাতে চাপ কম পড়ে সেদিকে নজর রাখা জরুরি।

➢ ব্যথা কমাতে গোড়ালিতে বরফের সেঁক নিতে পারেন। একটি বোতল বা পলিব্যাগে বরফ ভরে সেঁক নিন। সরাসরি বরফ না দেওয়াই ভালো।

➢ উষ্ণ গরম জল (চার মিনিট) ও ঠান্ডা জলে (এক মিনিট) পালটিয়ে পালটিয়ে পরপর সেঁক নিন।

➢ ব্যথা কমানোর জন্য স্টেরয়েড জাতীয় নয় এমন বেদনানাশক ওষুধ (আইবুপ্রোফেন, ডাইক্লোফেনাক, আসিক্লোফেনাক, ইন্ডোমিথাসিন প্রভৃতি) ব্যবহার করতে পারেন। তবে অবশ্যই চিকিৎসকের সঙ্গে পরামর্শ করে।

গোড়ালিতে আলট্রাসাউন্ড থেরাপি দিলে অনেক সময় ভালো ফল পাওয়া যায়। জুতোর সোল আর পায়ের মধ্যে সিলিকন হিল প্যাড ব্যবহার করতে পারেন।

➢ গোড়ালিতে আলট্রাসাউন্ড থেরাপি দিলে অনেক সময় ভালো ফল পাওয়া যায়।

➢ জুতোর সোল আর পায়ের মধ্যে সিলিকন হিল প্যাড ব্যবহার করতে পারেন।

➢ এসব পদক্ষেপ নিয়েও রোগ না সারলে ব্যথার জায়গায় স্টেরয়েড ইঞ্জেকশন দিতে হতে পারে।

➢ খুবই কম ক্ষেত্রে অপারেশনও করতে হতে পারে।

➢ যাঁরা দীর্ঘস্থায়ীভাবে এই রোগে আক্রান্ত হন তাঁদের কিছু নির্দিষ্ট স্ট্রেচিং ব্যায়াম শেখানো হয় ও অনেক সময় রাত্রে পায়ে একটি নির্দিষ্ট ধরনের স্প্লিন্ট ব্যবহার করতে দেওয়া হয়। অবশ্যই সেই ব্যায়াম ফিজিওথেরাপিস্ট-এর অধীনে করা দরকার।

➢ আর পারকিনসন বা আঙ্কাইলোজিং স্পন্ডাইলোসিস রোগ থাকলে তার উপযুক্ত চিকিৎসাও সঙ্গে জরুরি।

রোগ হওয়া আটকাতে কী কী পদক্ষেপ নেবেন?

☞ ওজন সঠিক সীমার মধ্যে রাখুন।

☞ সঠিক জুতো ব্যবহার করুন। হিলের উচ্চতা হাফ থেকে এক ইঞ্চি মতো হওয়া দরকার। তার বেশি নয়। সোল নরম ও পায়ের পাতার বক্রতার পরিপূরক হওয়া জরুরি। ছেঁড়া জুতো পরবেন না।

☞ যাঁরা দৌড়ান, তাঁরা হাজার কিলোমিটার দৌড়ের পর সম্ভব হলে জুতো পরিবর্তন করুন।

☞ বার বার এই রোগে আক্রান্ত হলে খেলাধুলো বা নাচের ধরনের মধ্যে পরিবর্তন আনুন। যাতে গোড়ালিতে চাপ তুলনামূলক কম পড়ে।

গোড়ালির স্পার (হাড়ের অস্বাভাবিক বেড়ে যাওয়া ছোটো টুকরো) কি সবসময় গোড়ালির ব্যথা সৃষ্টি করে?

গোড়ালির স্পার হল গোড়ালির হাড়ের অস্বাভাবিক বেড়ে যাওয়া ছোটো টুকরো। এটি সাধারণত গোড়ালির হাড়ের সামনের দিক থেকে পায়ের আর্চের দিকে বাড়ে। খুব কম ক্ষেত্রে পায়ের পেছনের দিকে গোড়ালির ওপরে টেন্ডো অ্যাকিলিস বরাবরও বাড়তে পারে। এই বেড়ে যাওয়া

যারা দৌড়ান, তারা হাজার কিলোমিটার দৌড়ের পর সম্ভব হলে জুতো পরিবর্তন করুন। বার বার এই রোগে আক্রান্ত হলে খেলাধুলো বা নাচের ধরনের মধ্যে পরিবর্তন আনুন। যাতে গোড়ালিতে চাপ তুলনামূলক কম পড়ে।

হাড়ের টুকরো সবসময় গোড়ালির ব্যথার সৃষ্টি করে না। অনেক ক্ষেত্রেই অপ্রত্যাশিতভাবে অন্য কোনো কারণে পায়ের এক্স-রে করাতে গিয়ে ধরা পড়ে। আগেকার দিনে অপারেশন করে হাড় বাদ দিয়ে চিকিৎসা করা হত। কিন্তু এখন সাধারণত অপারেশন করা হয় না। এর চিকিৎসার সঙ্গে প্ল্যান্টার ফাসাইটিস-এর চিকিৎসার বেশ মিল আছে।

আর একটা কথা বলি, ডাক্তারি পড়ার সময় প্রথম বর্ষে গোড়ালির হাড় (ক্যালকেনিয়াস) দেখে প্রথমে থ-হয়ে গিয়েছিলাম। কেমন একটা ব্যাঁকা-টেরা হাড়। যারা খুব ভালো করে চেনেন তারা ছাড়া বাকি যেকোনো সাধারণ মানুষের এই হাড়ের স্বাভাবিক নমুনা চোখে দেখলে মনে হবে যেন হাড়ে অস্বাভাবিক বৃদ্ধি আছে। এক্স-রে দেখে সাধারণ মানুষের পক্ষে স্বাভাবিক-অস্বাভাবিক বোঝা তো অসম্ভব। তাই অযথা ভয় পাবেন না। এতদিন যে 'স্পার' ছিল তা আর ক-দিন থাকলে হয়তো কোনো ক্ষতি করবে না, ওটাকে নিয়ে এ-স্পার ও-স্পার করার তাড়াহুড়ো না থাকতেই পারে। তবে অসুবিধে সৃষ্টি করলে ডাক্তারের সঙ্গে পরামর্শ করুন।

যা হোক, এটা বেশ কিছুদিন আগেকার কথা। এখন ওই ভদ্রমহিলার পা সেরে গেছে, কোনো অসুবিধে নেই। শুধু পায়ের ব্যথাই সারেনি, রোগী ডাক্তারের ওপর ভরসাও ফিরে পেয়েছেন, আর শেষদিন দেখাতে এসে চালের রুটি আর কষা গোস্ত ভালোবেসে খাইয়ে গেছেন পেট ভরে। স্বাস্থ্যের বৃত্তে

ডা. মৃন্ময়, এমবিবিএস, হাওড়ার শ্রমজীবী মানুষের জন্য তৈরি এক ক্লিনিকের সর্বসময়ের চিকিৎসক।

‘হার্ট ব্লক’— মানে কী বন্ধ হয়ে যাওয়া?

ডা. অপূর্ব

বেলা ২টা। মেডিক্যাল কলেজের কার্ডিয়োলজি আউটডোরের জনসমুদ্রটা তখন আস্তে আস্তে জনসরোবর হয়ে এসেছে। মাঝে একখানা ছোটো টেবিল আর খান-চারেক চেয়ার। আমার কো-হাউস ফিজিশিয়ান রাজীব আর আমি বসে অসহ্য গরমে ঘামতে ঘামতে ঝড়ের গতিতে পেশেন্ট দেখছি।

পেশেন্টের মুখের দিকে চাওয়ার সময় নেই, কাগজ দেখছি, ইসিজি দেখছি আর খসখস করে লিখে যাচ্ছি, একইসঙ্গে যা বলার মুখে বলে যাচ্ছি। একবার বই দু-বার নয়। অত সময় কোথা! বোঝার দায়িত্ব আপনার। রাগ হলেও কিচ্ছুটি করার নেই। সরকারি হাসপাতালের আউটডোরে সবাইকে ধৈর্য ধরে বোঝাতে গেলে একদিনের পেশেন্ট তিনদিনেও দেখে শেষ করা যাবে না। একটাই সুবিধা যে নতুন পেশেন্ট আর ক্রিটিক্যাল পেশেন্ট আমাদের দেখতে হয় না, দেখতে সময় লাগে, মন দিয়ে দেখতে হয়, ওগুলো স্যার আর পোস্ট-গ্রাজুয়েট দাদারা, যারা এমডি করছে তারা, দেখে নেয়।

তো কী বলছিলাম? হ্যা, এমন সময় কাকে যেন ইসিজি দেখে-টেখে এক নিশ্বাসে বলেছি, ‘আপনার হার্টে ব্লক আছে, একটা হল্টার করতে হবে, পেসমেকার লাগতে পারে, পরের বার হল্টারের রিপোর্ট নিয়ে আসবেন, ততদিন আবার মাথা ঘুরলে বা হার্টের গতি কমে গেলে এই ওষুধটা খাবেন। আসুন . . . নেক্সট . . . ’ একদম একনিশ্বাসে একটানা।

উনি দোনোমনা করে উঠলেন কি উঠলেন না, পরের জন ধাঁ বসে পড়লেন মিউজিক্যাল চেয়ারের দখল পাওয়ার মতো। আবার পালস, বিপি, ইসিজি, একতাড়া কাগজ . . .

একটু পর দেখি আগের জন কাগজ নিয়ে টেবিলের সামনে এসে দাড়িয়েছেন। আমার থোড়াই মুখ মনে আছে, বললুম, ‘লাইনে আসুন।’

উনি বললেন, ‘না স্যার, একটু আগেই দেখিয়ে গেলাম, আপনি বললেন ব্লক আছে পেসমেকার বসাতে হবে, আমার কিন্তু একবার অপারেশন হয়ে গেছে, ব্লক ক্লিয়ার হয়ে গেছে, আবার করাতে হবে অপারেশন!’ আসলে ওনার আগে একবার হার্ট অ্যাটাক হয়েছিল। আমাদের ভাষায় ইনফিরিয়র ওয়াল মায়োকার্ডিয়াল ইনফার্কশন। বাংলা করে বলতে গেলে, হার্ট বা হৃদ্‌যন্ত্রকে যেসব ধমনি রক্ত দেয়, আর রক্তের মাধ্যমে অক্সিজেন সরবরাহ করে, তাঁদের মধ্যে একটা বন্ধ হয়ে গেছিল। সেই ধমনি বন্ধ হওয়াকেও ‘ব্লক’ বলে। যেমন জলের পাইপ দিয়ে জল যাওয়া কোনো কারণে বন্ধ হয়ে গেলে আমরা বলি, ‘পাইপে ব্লক হয়েছে’, তেমনই। সেই ‘ব্লক’ হবার ফলে ওনার হার্টের স্পন্দনবাহী সার্কিটের ক্ষতি হওয়ায় ‘কমপ্লিট হার্ট ব্লক’ হয়েছে। সেটা রক্তবাহী নালীর বন্ধ হয়ে যাওয়া নয়, বরং ইলেকট্রিক লাইনের তার কেটে গিয়ে ইলেকট্রিক কারেন্ট বন্ধ হবার সঙ্গে তার মিল আছে। মানুষ এই দুটো ‘ব্লক’ শোনেন, দুটোই হার্টের ব্যাপারে, ফলে গুলিয়ে ফেলেন প্রায়ই।

আমার মাথায় এই সমস্ত কিছু কয়েক মাইক্রোসেকেন্ডে ভাবা হয়ে গেল, বলে ফেললুম, ‘শুনুন, আপনি বুঝবেন না, সেই ব্লক আর এই ব্লক এক জিনিস নয়, আপনার একবার হার্ট অ্যাটাক হয়েছিল না, তাতেই হার্টের ভেতরে কানেকশন গড়বড় হয়ে গেছে, বুঝলেন তো!

ওটা পেসমেকার না বসালে ঠিক হবে না। পরের দিন রিপোর্ট নিয়ে আসবেন, একবার তো বলেই দিলাম আপনাকে।’ ‘বলেন কী!’ ভদ্রলোক শোকস্তব্ধ। মুখ দেখে মনে হল সত্যিই ভিতরে বোধহয় কানেকশন লুজ হয়ে গেছে। আমার দুঃখ হল।

আমারই ভুল, ওরকম করে বলা উচিত হয়নি। তখন পেশেন্টও কমে এসেছিল, তাই ভাবলুম একটু সময় নিয়ে আশ্বস্ত করি ভদ্রলোককে।

বললুম, ‘আরে এত চাপ নিচ্ছেন কেন, বসুন।’ (কী বাওয়া! হার্টে কানেকশন গড়বড় হয়ে গেলে মানুষ চাপ নেবে না!)

উনি বসলেন। বাকি কয়েকটা পেশেন্ট রাজীবকে দেখতে বলে আমি ইকো-কার্ডিওগ্রাফির রিকুইজিশনের একটা কাগজ টেনে নিয়ে তার উল্টো পাশে সাদা দিকটায় ছবি আঁকতে শুরু করলুম। না না কোনো মজাক নয়, সত্যিই সিরিয়াসলি আঁকতে হল, ভদ্রলোককে বোঝানোর জন্য।

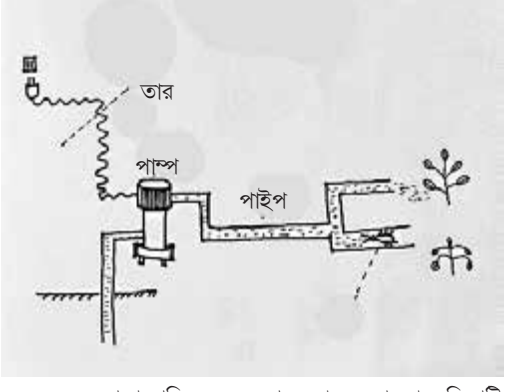

চিত্র ১. হৃদ্‌যন্ত্রের সাথে বাড়ির জলের কানেকশনের সাদৃশ্যের স্কিমাটিক চিত্র

আঁকা হয়ে গেলে বললুম, দেখুন এই হল গিয়ে জলের পাম্প, ইলেকট্রিকের কানেকশনে চলে। জল পাম্প হয়ে সমস্ত বাগানের গাছে গিয়ে পড়ে পাইপ বেয়ে। এই পুরোটা একটা সার্কিটের মতো তাই না!

এবার ধরুন, আপনার পাম্পের ইলেকট্রিক কানেকশনের মধ্যে কোথাও তার কেটে গেল, বা লো-ভোল্টেজ হল, বা শর্ট সার্কিট হয়ে তার গলে গেল, তাতে কী হবে? হয় পাম্প ফেল মারবে, বা বেগড়বাঁই করবে। তাতে করে জল কি ভালোভাবে পাম্প হবে? হবে না।

আবার ধরুন এপাশে ইলেকট্রিকের কানেকশন সব ঠিক রইল, কিন্তু ওপাশে জলের পাইপের মধ্যে ধরুন একটা আরশুলা বা ইদুর গিয়ে সেঁদোল, তাতে পাইপের জল বহন ক্ষমতা কমে গিয়ে গাছে জল কম পৌঁছোতে পারে, বা পুরোটাই যদি ব্লক হয়ে গিয়ে থাকে তাহলে কিছুই পৌঁছোবে না, তাই না। জল না পেয়ে গাছটা আস্তে আস্তে মারা পড়বে। তার আগেই যদি ব্লকটা ক্লিয়ার করে দেওয়া যায় তাহলে ঝিমোনো গাছ আবার সোজা হয়ে দাঁড়াবে। বুঝলেন?

এতক্ষণ উনি মন দিয়ে ঝুঁকে পড়ে টেবিলে কাগজখানা দেখছিলেন, প্রশ্ন করতে সম্বিত ফিরে পেলেন, 'হ্যাঁ, কিন্তু হার্টের ব্যপারটা বুঝলুম না তো!'

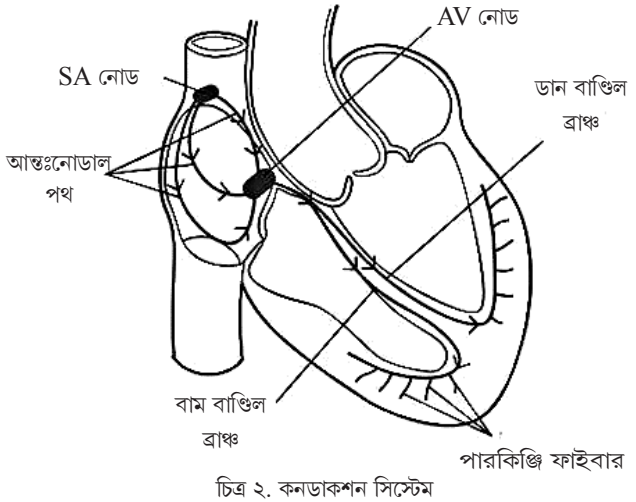

চিত্র ২. কনডাকশন সিস্টেম

"আসছি, দাঁড়ান। ছবিটা এত দুর বুঝতে কোনো অসুবিধা না থাকলে এবার একটা কাজ করুন, মনে মনে ওই পাম্পটাকে ধরে নিন আপনার হার্ট। পাম্পের ইলেকট্রিক কানেকশন হল গিয়ে হার্টের স্পন্দন সংবাহীপথ বা কনডাকশন সিস্টেম, আর ওই বাগানের গাছে জল পৌঁছোনোর পাইপ হল গিয়ে আপনার হার্টের নিজের রক্ত সরবরাহকারী রক্তবাহী বা করোনারি আর্টারি সিস্টেম, যা কিনা হার্টের মাসলগুলোকেই অক্সিজেন, খাবার সাপ্লাই দেয়, যা না পেলে পরিশ্রমী হৃদ্‌পেশি মারা পড়ে। [পাঠকদের জন্যে কনডাকশন সিস্টেম (চিত্র. ২) আর করোনারি সিস্টেমের (ছবি. ৩) আসল ছবিও দেওয়া গেল, সত্যি সত্যি তো আর ওরকম তার আর পাইপ নেই হার্টের ভেতর!]

আপনার চার বছর আগে হঠাৎ করে যে ব্লকটা হয়েছিল, সেটা ওই পাইপের মধ্যে ব্লক ছিল। চর্বির আস্তরণ পড়ে গিয়ে পাইপের একটা অংশ বন্ধ হয়ে গিয়েছিল, যার ফলে হৃদ্‌পেশিতে ঠিকঠাক অক্সিজেন পৌঁছোচ্ছিল না। যাকে বলে মায়োকার্ডিয়াল ইনফার্কশন (হৃদ্‌পেশিতে অক্সিজেন সাপ্লাই ব্লক হয়ে গিয়ে যে রোগ) বা সোজা বাংলায়(!) হার্ট অ্যাটাক। এটা হল এক ধরনের হার্টব্লক। যদিও হার্টব্লক বলতে ডাক্তারেরা সাধারণভাবে অন্য ধরনের ব্লকের কথা বোঝান, হার্টের ইলেকট্রিক কানেকশনে গণ্ডগোল বোঝান। সেটার জন্য সে বার আপনার হার্টের অ্যাঞ্জিয়োপ্লাস্টি হয়, হার্টের রক্ত সরবরাহকারী রক্তবাহী নালীর স্টেন্ট বসিয়ে ব্লক দূর করা হয়। কিন্তু হার্টের কিছুটা অংশ তার আগেই ক্ষতিগ্রস্ত হয়ে গিয়েছিল। সেই ক্ষতিগ্রস্ত অংশের মধ্যে দিয়েই হার্টের 'ইলেকট্রিক ওয়েরিং'-এর খানিকটা ছিল। তার জন্যে হার্টের ইলেকট্রিক কানেকশনে গণ্ডগোল দেখা দেয়। তাতেই আপনার হার্টখানা এখন মাঝে মাঝে বেগড়বাই করছে, মাঝে মাঝে আস্তে চলছে, মাঝে মাঝে জোরে চলছে। বুঝলেন তো?

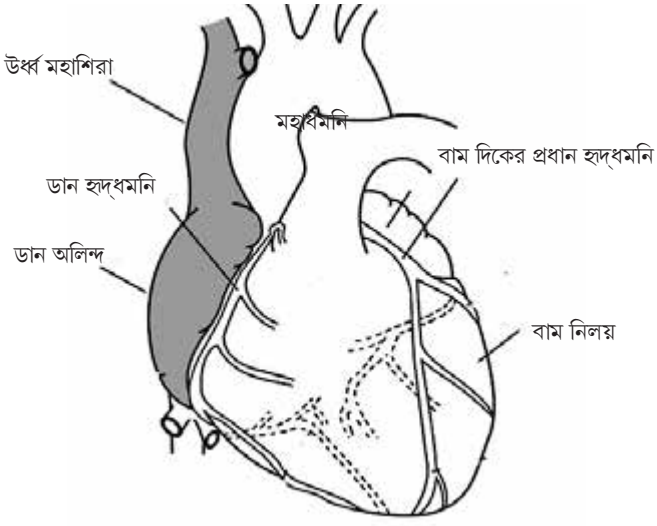

চিত্র ৩. করোনারি সিস্টেম

এটা হল গিয়ে আপনার কনডাকশন ব্লক (স্পন্দনবাহী পথের ব্লক)। ডাক্তাররা সচরাচর এই ধরনের ব্লককেই হার্টব্লক বলেন। এই দু-ধরনের ব্লক সম্পূর্ণ আলাদা, এদের কারণও আলাদা, এদের লক্ষণ, সমস্যা, চিকিৎসাও সম্পূর্ণ আলাদা। হার্ট অ্যাটাক বা হার্টের রক্তবাহের ব্লকের ক্ষেত্রে সময়ে হাসপাতালে পৌঁছোলে ওষুধ দিয়ে বা অ্যাঞ্জিয়োপ্লাস্টি করে ব্লক কাটানো যায়, দেরি হয়ে গেলে খুব কিছু করা যায় না, কিন্তু আরও ক্ষতি যাতে না হয় তারজন্য ওষুধপত্র দেওয়া হয়।

আবার কনডাকশন ব্লক (হার্টের ইলেকট্রিকাল সার্কিটে ব্লক) থাকলে তার আলাদা ওষুধ আছে, প্রয়োজনে পেসমেকার বসিয়ে হার্টের গতি নিয়ন্ত্রণে রাখা হয়।

কিন্তু দু-ধরনের সমস্যাকেই ডাক্তাররা 'হার্টে ব্লক আছে' বলেন। তাতে রোগীরা ঘেঁটে যান, ভাবেন একবার ব্লক ক্লিয়ার করানো হল, ইনি বলছেন আবার ব্লক! আসলে সবসময় ভালো করে বোঝানোর সময়ই পাওয়া যায় না, তাতে রোগী, ডাক্তার উভয়েরই সমস্যা বাড়ে।

এরপর বললুম, 'কিছুটা ক্লিয়ার হল?'

'হ্যাঁ', একগাল হাসলেন উনি।

বললুম, 'বাড়ি যান, গিয়ে হল্টারের রিপোর্টটা করান, ইলেকট্রিক সার্কিটের কীরকম ব্লক, পেসমেকার লাগবে কিনা হল্টার দেখে বলতে পারব। বুঝলেন তো? তাহলে আসুন এবার। আর হ্যাঁ সুগার, কোলেস্টেরল কন্ট্রোল করুন, জ্যেঠিমাকে বলবেন ভালোমন্দ খাবার-দাবার রেঁধে আপনাকে তো ইচ্ছেমতো খাওয়াতে পারবেন না, আমাদের জন্যে পাঠিয়ে দিতে, ঠিক আছে?'

ভদ্রলোক হাসতে হাসতে উঠে দাঁড়ালেন। তারপর আমাকে অবাক করে দিয়ে ছবি আঁকা কাগজটা প্যাড থেকে ছিঁড়ে পকেটে পুরে ফেললেন। বললেন, 'বউকে বোঝাতে ছবিটা কাজে লাগবে, যে আমার আগেরবার "পাইপে ব্লক" হয়েছিল, এবার "তারে ব্লক" হয়েছে।'

কিছুদিন আগে উনি আবার এসেছিলেন, পেসমেকারের স্টিচ কাটাতে, গিন্নি সমেত। ভালো আছেন। আর আমরা ভালো মন্দ কী কী খেলাম সেটা আর নাই বললাম! স্বাস্থ্যের বৃত্তে

ডা. অপূর্ব, এমবিবিএস ,শ্রমজীবী মানুষের জন্য তৈরি একটি ক্লিনিকের সঙ্গে যুক্ত।

Advt.

সবার জন্য স্বাস্থ্য সম্ভব?

কেন্দ্র সরকারের কমিটি বলছে

সম্ভব

সরকার বলছে

অসম্ভব

আমরা বলছি

সবার জন্য স্বাস্থ্য চাই।

আপনি?

'সবার জন্য স্বাস্থ্য' প্রচার কমিটি

একটি জরুরি লেখা!
অ্যান্টিবায়োটিকের যুগ শেষ

ডা. অনির্বাণ বিশ্বাস

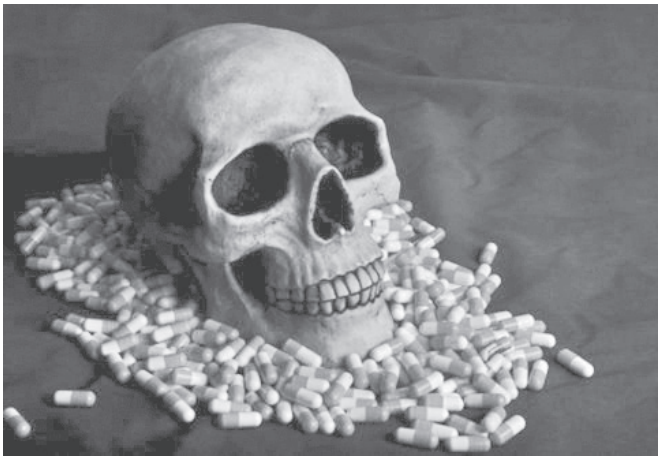

অ্যান্টিবায়োটিক পরবর্তী যুগ হল মানুষের বিদায়ের সময়। খানিকটা কাব্যিক শোনাতে পারে। আমি নিশ্চিত করছি আপনাদের, এখানে কাব্যিক কিছু নেই। নিতান্তই বাস্তব দুঃসংবাদ লিখতে শুরু করেছি। আপনি পড়তে পারেন, নাও পড়তে পারেন। আমরা ইতিমধ্যেই আমাদের নির্বুদ্ধিতার খেসারত দিতে শুরু করেছি!

আমরা গত তিন দশকেরও বেশি সময় ধরে অদ্ভুত এক স্বর্গরাজ্যে বাস করছি। গত শতকের মাঝামাঝি অথবা তার আগের সময়ে ফিরে গিয়ে যদি কিছুদিন আমরা বেঁচে আসতে পারতাম তাহলে জীবন কাকে বলে সেই ধারণা খানিকটা আমাদের হতে পারত!

টাইফয়েডে মানুষ মরে যেতে দেখেছেন? দেখবার সম্ভাবনা কম। কারও টাইফয়েড হয়েছে শুনে আঁতকে উঠেছেন। দুঃখ পেয়েছেন। ঠিক যেমন কারও ক্যান্সার হয়েছে শুনে দুঃখ পান, সেরকমটা না হলেও, অনেকটা ওরকমই। বরং ভেবেছেন ঠিকমতো ওষুধ খেয়ে বিশ্রাম নিলেই সেরে উঠবে টাইফয়েডের রোগী। ফোঁড়া কাটতে হবে শুনে নিশ্চয় ভয় পাননি। ফোঁড়া কাটলে মানুষটা না-ও বাঁচতে পারে বলে কখনো ভাবেননি। ডায়রিয়ায় কত মানুষ মরতে দেখেছেন? ওলাবিবির আক্রমণে গঞ্জ-গ্রাম উজাড় হয়ে যেত একটা সময়ে। এই দেশে। পৃথিবীর অনেক দেশেই। শামুকে পা কেটে গিয়ে মানুষ মরে যেতে পারে বলে মনে হয় আপনার? আমরা জানি, সে প্রায় অসম্ভব এখনকার সময়ে।

অনেক দিন হল গড়পড়তা রোগের নামে আমাদের বুক কাঁপে না। আমাদের এতদিন ছিল স্বর্গবাসের দিন। কেননা আমাদের রয়েছে অ্যান্টিবায়োটিক। জাদুর গুলি।

যে দুঃসংবাদটি দিতে চাইছিলাম, সেটি হচ্ছে, অ্যান্টিবায়োটিকের স্বর্ণযুগ শেষ হয়েছে। আমাদের স্বর্গবাসের সময়ও শেষ হয়েছে। আমাদের নরক দর্শনের দিন এখন। তবে কিছু হিসেবে আমরা খানিকটা ভাগ্যবান। সত্যিকারের নরক দেখবে আমাদের সন্তানেরা। বস্তুত নরক তারা এখন থেকেই দেখতে শুরু করেছে।

তৃতীয় প্রজন্মের সেফালোস্পোরিন একটা খুব ভালো ওষুধ ছিল। জুটিবেঁধে থাকা গোল গোল এক ব্যাকটিরিয়া জাতের শেষ ওষুধ। আগে সেফালোস্পোরিন খেলে ব্যাকটিরিয়া চামড়া ফুটো হয়ে তার নাড়িভুঁড়ি বাইরে এসে পড়ত। গনোকক্কাল সংক্রমণের (যেমন,

যে দুঃসংবাদটি দিতে চাইছিলাম, সেটি হচ্ছে, অ্যান্টিবায়োটিকের স্বর্ণযুগ শেষ হয়েছে। আমাদের স্বর্গবাসের সময়ও শেষ হয়েছে। সত্যিকারের নরক দেখবে আমাদের সন্তানেরা। বস্তুত নরক তারা এখন থেকেই দেখতে শুরু করেছে।

গনোরিয়া) শেষ ভরসা সেফালোস্পোরিন এখন আর আমাদের ভরসা জোগাতে পারে না। সেফালোস্পোরিন প্রতিরোধী ব্যাকটিরিয়া ছড়িয়ে গেছে সারা দুনিয়ায়। আর এখনও সারা দুনিয়ায় প্রতিদিন কম করেও ১০ লাখ মানুষ গনোরিয়ায় সংক্রামিত হয় !

কার্বাপেনেম/ইমিপেনেম জাতের অসাধারণ অ্যান্টিবায়োটিক ছিল আমাদের। প্রাণঘাতী পেটের অসুখের ওষুধ (নিশ্চয়ই হেসে ফেলছেন অনেকে? পেটের অসুখে আবার মানুষ মরে নাকি! এতদিন মরত না পুরোনো অ্যান্টিবায়োটিকের জোরেই)। শিশুদের নির্দিষ্ট কিছু সংক্রমণ, নিউমোনিয়া, রক্তের সংক্রমণ ইত্যাদি ক্ষেত্রে কার্বাপেনেম/ইমিপেনেম ছিল আমাদের বাঁচবার সর্বশেষ উপায়। এছাড়াও সেপ্টিসিমিয়ায় (যেখানে সমস্ত শরীর ইনফেকশনে সংক্রামিত) এটাই ছিল প্রধান ওষুধ। এখন অনেক ব্যাকটিরিয়া এই জীবনদায়ী অ্যান্টিবায়টিকের বিরুদ্ধে রেজিসটেন্স তৈরি করেছে।

ফ্লোরোকুইনোলন নামের একটা গোত্রের অ্যান্টিবায়োটিক ব্যাকটিরিয়ার ডিএনএ এ বিরাট গণ্ডগোল করে দিতে পারত। মুখ আর মূত্রনালীর সংক্রমণে অতি চমৎকার ওষুধ! এখনকার প্রতিরোধী ব্যাকটিরিয়া ফ্লোরোকুইনোলনে ডুবেও মরবে না। আমাদের মায়েদের, মেয়েদের মূত্রনালীর সংক্রমণের ভয় সবচেয়ে বেশি। আমাদের শিশুদের রয়েছে মারাত্মক মুখের সংক্রমণের ভয়। আমরা কী করব এখন?

স্টেফাইলোকক্কাস অরিয়াস নামের একটা জাত রয়েছে ব্যাকটিরিয়ার। ল্যাবরেটরিতে খুব সহজে দারুণ সব পরীক্ষা করা যায় একে নিয়ে, সে আর বলার নয়! এই জাতটাকে যখন পাওয়া যায় তখন পরীক্ষার পাত্রে স্বর্ণের মতো তাদের রং ছিল বলে এই জাতের নাম দেয়া হয়েছিল "অরিয়াস" (লাতিন শব্দ 'অরাম' অর্থ স্বর্ণ)। আঙুরের মতো থোকা বেঁধে জটলা পাকিয়ে থাকে, আর দেখতে গোল বলে গোত্রের নাম হয়েছিল "স্টেফাইলোকক্কাস"। অতি চমৎকার ব্যাকটিরিয়া। বাস করে মানুষের ত্বকে। কিন্তু এরাই সামান্য কেটে গেলে অথবা নগণ্য ক্ষত থেকে মানুষের জীবন নিয়ে নিতে পারে! এরা এই সময়ে অ্যান্টিবায়োটিক প্রতিরোধী ব্যাকটিরিয়াদের মধ্যে সামনের সারিতে রয়েছে!

এ সামান্যই। বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার দেয়া তথ্য খানিকটা তুলে দিয়েছি। মূল রিপোর্টটা (http://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/112642/9789241564748_eng.pdf;jsessionid=711D-433C444FD8F9A3CC9FF2867ABECC?sequence=1) পড়লে খানিকটা বিস্তারিত জানা যেতে পারে।

২০১৪ সালের শেষ হিসেব থেকে আমরা এখন জানি, সারা পৃথিবী অ্যান্টিবায়োটিক প্রতিরোধী জীবাণুতে ছেয়ে হয়ে গেছে! খুব সামান্য সংক্রমণ আর সাধারণ রোগেও এখন মানুষ মরে যাবে। যেমন হত ৫০ বছর আগে। যেসব সাধারণ রোগকে আমরা পাত্তা দিতে শিখিনি, খুব অবাক হয়ে এখন আবিষ্কার করব সেইসব রোগেই আমাদের প্রিয়জনেরা মরে যাচ্ছে! অবাক করা বিষয় হচ্ছে পৃথিবীর বেশিরভাগ দেশেই অ্যান্টিবায়োটিক প্রতিরোধী ব্যাকটিরিয়া সম্পর্কিত তথ্য সংগ্রহ এবং তা যাচাইয়ের ব্যবস্থা নেই। তার মানে আমরা জানিও না ঠিক কী কী বিপদ আমাদের জন্য অপেক্ষা করছে! (সকল দেশেই ভারী আকারের প্রতিরক্ষা বাজেট রয়েছে! সত্যিকারের বুদ্ধিমান কোনো প্রাণী যদি জানত আমরাও নিজেদেরকে বুদ্ধিমান বলে দাবি করি তাহলে কী হাসাহাসিটাই না তারা করত!)

ব্যাকটিরিয়া অ্যান্টিবায়োটিক প্রতিরোধী হওয়ার বড়ো কারণ হচ্ছে তাদের জীবনের চক্র অতি দ্রুত ঘোরে। তার মানে তারা অতিদ্রুত বংশবৃদ্ধি করতে পারে।

জিনের সংকেত, যাতে জীবনের নিয়ম লেখা থাকে, সে বদলায়। বদলানো কঠিন। কিন্তু বদলায়। প্রজন্ম থেকে প্রজন্মে বদলে যায় প্রজাতির রকম। ব্যাকটিরিয়া যেহেতু দু-চারদিনে প্রজন্ম থেকে প্রজন্মের যাত্রা পার করে ফেলে তাই তাদের জিনের সংকেত বদলায় খুব দ্রুত। সেইজন্য তাদের ভেতর প্রতিরোধী জিন তৈরির সম্ভাবনাও বেশি।

এবং আমরা তাদেরকে সাহায্য করি। বুড়ো ডারউইনের কথা তো আপনারা জানেনই। প্রাকৃতিক নির্বাচনে যোগ্যরাই টিকে থাকে। আমরা সবাই মিলে প্রাকৃতিক নির্বাচনে খুব দ্রুত অ্যান্টিবায়োটিক প্রতিরোধী ব্যাকটিরিয়াদের টিকে থাকার সুযোগ করে দেই। উদাহরণ দিয়ে বোঝাতে চেষ্টা করি।

ধরুন হারাধনের দশটি ছেলেকে ছেড়ে দেয়া হল কলকাতা শহরে। তারা আর দশটা মানুষের মতোই অতি সাধারণ। কেবল তারা বিশেষ একটা জলের ফিল্টার বানাতে পারে যা আর কেউ পারে না। এখন তাদের পক্ষে কলকাতা শহরের নিয়ন্ত্রণ নিয়ে বাচ্চাকাচ্চা নাতিপুতি মিলে কলকাতা শহরে রাজত্ব করবার সম্ভাবনা ১৫ লক্ষে ১ (ধরছি কলকাতার জনসংখ্যা ১৫০ লক্ষ)। এত কম সম্ভাবনা হলে সেটাকে পাত্তা না দিলেও চলে। এখন যদি একটা অজানা কারণে কলকাতার জল বিষাক্ত হয়ে যায়? ওই একটি ফিল্টারের গুণে হারাধনের দশটি ছেলের কলকাতা শহরের মালিক হয়ে যাওয়ার সম্ভাবনা একশো ভাগ।

আমরা যখন আমাদের পছন্দমতো অ্যান্টিবায়োটিক কিনে খাই তখন ওইরকম প্রাকৃতিক নির্বাচনে সাধারণ ব্যাকটিরিয়া মেরে প্রতিরোধী ব্যাকটিরিয়াদের টিকে থাকার এবং ছড়িয়ে যাওয়ার সুযোগ করে দেই।

একটা অ্যান্টিবায়োটিকের পরিচিতি আমাদের কাছে কেবল একটি ওষুধ। কিনে খেলেই হয়। কিন্তু বস্তুত অ্যান্টিবায়োটিকে মহাভারতের গল্প থাকে। সব অ্যান্টিবায়োটিক সব ব্যাকটিরিয়াকে মারতে পারে না, সবের মাত্রা এক নয়, সবের ক্ষমতা এক নয়, সবের কার্যপ্রণালীও ভিন্ন! অ্যান্টবায়োটিক পরস্পরের বিরোধী হতে পারে, পরস্পরের সহযোগী হতে পারে। অন্য ওষুধ/পদার্থের উপস্থিতিতে কখনো ইতিবাচক কখনো নেতিবাচক আচরণ করতে পারে! একটা অ্যান্টিবায়োটিক নিয়ে দশটা মহাকাব্য লিখে ফেলা যায়। একশোটা

জীবন পার করে দেয়া যায় একটা অ্যান্টিবায়োটিকের ঠিকুজি বুঝতে বুঝতে!

আমি বলছি না সবাইকে অ্যান্টিবায়োটিকের মহাভারত মুখস্থ করে ফেলতে হবে। কিন্তু মানুষের সবচেয়ে প্রয়োজনীয় জিনিসটি অন্তত কীভাবে ব্যবহার করতে হয় সেই তথ্যটুকু জানার এবং সেটা মেনে চলার মতো বুদ্ধিমত্তা তো আমরা দেখাতেই পারতাম, তাই না?

একটি ব্যাকটিরিয়ার একটি অ্যান্টিবায়োটিক প্রতিরোধী জিন থাকলে সেটা সে অন্যদের মাঝে ছড়িয়ে দিতে পারে। তার নিজের বংশধরেরা তো সেই জিন পায়-ই। এমনকী সেই ব্যাকটিরিয়াটি যদি মরে ছাতু হয়ে যায় তবুও প্রকৃতিতে পড়ে থাকা তার প্রতিরোধী জিন তুলে নিয়ে কাজে লাগাতে পারে অন্য ব্যাকটিরিয়া! একটি ব্যাকটিরিয়া কীভাবে অ্যান্টিবায়োটিক প্রতিরোধী হয়ে উঠতে পারে সেই তালিকা দেয়া তাই সহজ নয়!

সব মিলিয়ে সেজন্য আমরা নিশ্চিত জানি ব্যাকটিরিয়া অ্যান্টিবায়োটিক প্রতিরোধী হবেই। কিন্তু আমরা সেই হার কমিয়ে আনতে পারি। তাদের ছড়িয়ে যাওয়া রোধ করতে পারি। আর পারি

বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার এই হিসেবটা আজ না হোক কাল পেতে হবে সেটাও জানতাম। কিন্তু বড্ড তাড়াতাড়ি দুঃসংবাদটা পেয়ে গেলাম বলে মনে হচ্ছে। যেসব ঠুনকো রোগকে পাত্তাই দিতে শিখিনি আমরা, সেইসব সামান্য সংক্রমণ থেকে কী বিপদ হতে পারে ভাবলে ভয়াবহ ক্রোধে মাথা বিস্ফোরিত হতে চায়

নতুন আরও শক্তিশালী, আরও বিশেষায়িত অ্যান্টিবায়োটিক তৈরি করতে! সেই ক্ষমতা আমাদের রয়েছে। কিন্তু এই পৃথিবীতে নতুন অ্যান্টিবায়োটিক নিয়ে গবেষণা হয় কতটা? আপনি সেই হিসেব নিজেই করতে পারেন। এই দেশের ১২৫ কোটি মানুষের জন্য অ্যান্টিবায়োটিক নিয়ে গবেষণা করার মতো উচ্চতর গবেষণাগার একটিও নেই। একটি জাতির বুদ্ধিমত্তা যে কত করুণ কৌতুক হতে পারে সে জানতে আমাদেরকে দেখা যেতে পারে!

প্রসঙ্গত মনে পড়ল, আমাদের ক্ষেপণাস্ত্র রয়েছে। যুদ্ধবিমান রয়েছে। ধারণা করি, এইসব ক্ষেপণাস্ত্র কিনে বেড়ানো বুদ্ধিমানেরা ওই ক্ষেপণাস্ত্রে ভর করেই প্রতিরোধী ব্যাকটিরিয়াদের থেকে পালাবার চিন্তা করে নিশ্চিন্ত থাকেন! অথবা তারা নিজেরা যে কীরকম বিপদে রয়েছেন সে বুঝতে যেরকম বুদ্ধিমত্তা দরকার হয় ওনাদের বুদ্ধিমত্তা তার চাইতে খানিকটা বেশি বেশি!

***

'ডিনায়াল' পর্যায়ে যারা নেই তারা সম্ভবত এখন কী করা যেতে পারে বলে একটা প্রশ্ন করতে চাইছেন।

এই পৃথিবীর সকলে মিলে চেষ্টা করা যেত। এবং সেরকম হলে মানুষের টিকে যাওয়া খানিকটা নিশ্চিত হতে পারত। কিন্তু সে হয়নি। হবেও না। সেইজন্য কোনো আশার বাণী শোনাতে পারছি না।

আগে ভাবতাম, অসুখ-বিসুখ তো মানুষের হয়ই। কোন ভয়ংকর কিছু যেন না হয় আমার স্বজনদের। বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার এই হিসেবটা আজ না হোক কাল পেতে হবে সেটাও জানতাম। কিন্তু বড্ড তাড়াতাড়ি দুঃসংবাদটা পেয়ে গেলাম বলে মনে হচ্ছে। যেসব ঠুনকো রোগকে পাত্তাই দিতে শিখিনি আমরা, সেইসব সামান্য সংক্রমণ থেকে কী বিপদ হতে পারে ভাবলে ভয়াবহ ক্রোধে মাথা বিস্ফোরিত হতে চায়!

বিশেষত যখন আমি জানি সবকিছুর পরেও কিছু বদলাবে না। পৃথিবীর শিক্ষা আর গবেষণা বাজেট কোনো জাদুবলেই আশাপ্রদ হয়ে উঠবে না। পৃথিবীর নীতিনির্ধারকেরা কোনো মন্ত্রেই মানুষের প্রতি মমতা দেখাতে শিখবে না!

দু-টি উদাহরণ—

১

আমার এক ছাত্র ছিল। জীবনের একটা সময় আমার কাছে প্রায়ই এসে নিঃশব্দে কাঁদত। কারণ জানেন? সেই সময় ওর মরণাপন্ন বাবার চিকিৎসা চলছিল। তাঁর জ্বর ছাড়ছিল না। শেষে দেখা গেল তাঁর মেনিনজাইটিস হয়েছে। এবং CSF (পিঠের শিরদাঁড়ার পাশ থেকে বের করা এক ধরনের ফ্লুইড, যা কিনা ব্রেন স্পাইনাল কর্ডকে ঘিরে রাখে) এর স্টাডি-তে দেখা গিয়েছিল ওনার মেনিনজাইটিস্ হয়েছে এবং সেই সময় (২০০৭) বাজারে অ্যাভেইলেবল সমস্ত অ্যান্টিবায়োটিকের বিরুদ্ধে আক্রান্তকারী জীবাণু রেজিসটেন্ট।

এখনও ছেলেটির কান্না আমার কানে ভাসে।

২

যতদিন যাচ্ছে, MDR (Multi Drug Resistant) TB রোগ বাড়ছে। কেন,তার কার্যকারণে আমি যাব না। তবে MDR TB সাংঘাতিকভাবে ছড়াচ্ছে। চিকিৎসা তার আছে। কিন্তু অনেকাংশেই রোগী তা নিতে পারছে না। ফলত XDR TB যা কিনা প্রায় সমস্ত ওষুধের বিরুদ্ধে রেজিসট্যান্ট এবং অবধারিত মৃত্যু।

চলুন, আমরা সবাই বর্তমান প্রজন্মের এপিটাফ লিখি। আমাদের পরবর্তী প্রজন্মের কাছে এক মৃত্যুময় ভবিষ্যৎ উপহার দিয়ে।

স্বাস্থ্যের বৃত্তে

ডা. অনির্বাণ বিশ্বাস, এমবিবিএস, এমডি (পালমোনলজি), একটি সরকারি মেডিক্যাল কলেজে বক্ষরোগ বিভাগের প্রাক্তন অধ্যাপক।

শরীরের রোগ না মনের রোগ?

ডা. সুমিত দাশ

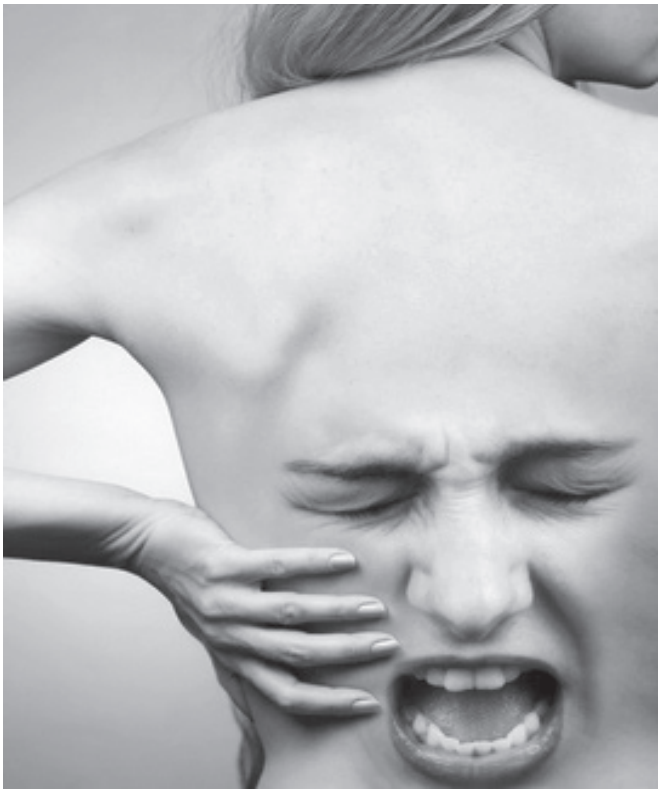

সাইকি (Psyche) মানে মন এবং সোমা (Soma) মানে হচ্ছে শরীর। এই দুটো মিশিয়ে এক ধরনের রোগ আছে যাদের বলা হয় সাইকোসোমাটিক ডিসঅর্ডার (Psychosomatic Disorder)। গত পঞ্চাশ বছর ধরেই গবেষণা এবং চিকিৎসা ক্ষেত্রে এই সাইকোসোমাটিক ডিসঅর্ডার এক বড়ো প্রতিপক্ষ। প্রকৃতপক্ষে সাইকোসোমাটিক বলতে বোঝানো হয় মন অর্থাৎ মনের চাপ বা আবেগ কীভাবে শরীর বা শরীরের রোগকে প্রভাবিত করে। অর্থাৎ মানসিক চাপের কমা-বাড়ার সাথে সাথে রোগের শারীরিক উপসর্গ কমা-বাড়ার সম্পর্কের কথা বোঝা যায়। কিন্তু দেখা গেল, বিশেষ করে সাধারণ মানুষ এই ধরনের রোগাক্রান্তদের তাচ্ছিল্য করছে এই বলে যে তাদের কিছু হয়নি 'মাথাটাই' খারাপ হয়ে গেছে। তাই বর্তমানে সাইকোসোমাটিক কথাটা তুলে দিয়ে সোমাটিক সিম্পটম ডিসঅর্ডার (Somatic Symptom Disorder) বলা হয়— কথাটার মানে হল শারীরিক উপসর্গ বিকার।

কী উপসর্গ থাকে?

অধিকাংশ ক্ষেত্রে এই ধরনের রোগীরা শরীরের সাধারণ অনুভূতি যেমন পেটে বা মাথার চাপ বা ব্যথাকে অন্যভাবে ব্যাখ্যা করেন। এঁরা ক্রমশ ভাবতে থাকেন এঁদের একটা কঠিন রোগ হয়েছে। এঁরা বিভিন্ন শরীরের চিকিৎসক বা জেনারেল ফিজিশিয়ান থেকে শরীরের অন্যান্য বিশেষজ্ঞ চিকিৎসক এমনকী শল্য-চিকিৎসকের কাছেও চলে যান। বিভিন্ন পরীক্ষানিরীক্ষায় কিছু পাওয়া যায় না। আর যতই এই কিছু না পাওয়া হয় ততই এঁদের দৃঢ় ধারণা হয় রোগটা ডাক্তারবাবু ধরতে পারছেন না।

একটা উদাহরণ দেওয়া যাক। একজন রোগী ডাক্তারের কাছে এলেন বামদিকের তলপেটে ব্যথা নিয়ে। পরে দেখা গেল আনুষঙ্গিক অনেক উপসর্গই আছে যেমন পেট ভুটভাট করে, মনে হয় পেটে কী চলে বেড়াচ্ছে, একদিক ফুলে শক্ত হয়ে যাচ্ছে, হজমের গণ্ডগোল

> এই রোগের মূল কারণ মানসিক। কিন্তু সবথেকে বড়ো সমস্যা হচ্ছে রোগী সেটা মানতে চান না আর সেটাই চিকিৎসাক্ষেত্রে সবথেকে বড়ো বাধা।

হচ্ছে, পাতলা পায়খানা বা কোষ্ঠকাঠিন্য হচ্ছে। সর্বোপরি তিনি দুর্বল হয়ে পড়ছেন এবং কাজের উৎসাহই হারাচ্ছেন। পেটের মতো অন্যান্য অঙ্গের উপসর্গ নিয়েও আসেন। এবং সময়ের সঙ্গে সঙ্গে এক অঙ্গ থেকে অন্য অঙ্গের উপসর্গ নিয়ে এঁরা নতুন করে আসেন।

একদল রোগী আছেন যাঁদের উপসর্গ হচ্ছে শরীরের কোথাও একটা যন্ত্রণা বা পেন (Pain)। যেহেতু কোনো শরীরের কারণ খুজে পাওয়া যায় না তাই এঁদেরকে একসময় পেন ডিসঅর্ডার (Pain Disorder) রোগী বলা হত। এঁদের যন্ত্রণা এত প্রবল হয় অনেক সময় এঁরা সার্জন ডাক্তারকে জোর করেন অপারেশন করার জন্য।

যেহেতু এইসব রোগীর উপসর্গের নিরাময় হয় না তাই দেখা গেছে এঁদের অধিকাংশ উদ্‌বেগ বা অবসাদ রোগে ভোগেন। আর যাঁদের এই

রোগ দীর্ঘমেয়াদি বা ক্রনিক হয়ে গেছে তাঁদের প্রায় প্রত্যেকেই অবসাদে ভোগেন।

রোগের ভবিষ্যৎ

সাধারণত শারীরিক উপসর্গ হঠাৎ করে আসে এবং ছয় মাস থেকে কয়েক বছর পর্যন্ত থাকে তারপর ঠিক হয়ে যায়। অনেক ক্ষেত্রে দীর্ঘমেয়াদি বা ক্রনিক হয়ে যায়। কিছু কিছু উপসর্গ সবসময় থেকেই যায় এবং মাঝে মাঝে তীব্ররূপ ধারণ করে।

চিকিৎসা

এই রোগের মূল কারণ মানসিক। কিন্তু সবথেকে বড়ো সমস্যা হচ্ছে রোগী সেটা মানতে চান না আর সেটাই চিকিৎসাক্ষেত্রে সবথেকে বড়ো বাধা। তাঁদের শরীরের উপসর্গকে গুরুত্ব দিতে হবে তাই মাঝে মাঝে শরীরের পরীক্ষা করতে হবে। তবে খুব প্রয়োজন না হলে ল্যাবরেটরি পরীক্ষানিরীক্ষা না করাই ভালো। তাঁদের কাছে রোগকে ব্যাখ্যা করতে হবে সঠিক তথ্য দিয়ে। যেমন আবেগ ও যন্ত্রণা কীভাবে কাজ করে, মস্তিষ্কের কোনো অংশের ভূমিকা যেমন লিম্বিক সিস্টেম, এগুলো বোধগম্যভাবে বোঝাতে হবে। রোগ সম্পর্কে অভয় দিতে হবে। সার্ট্রালিন, এসসিটালোপ্রাম জাতীয় ওষুধ ব্যবহার করা হয়। এছাড়া অ্যামিট্রিপিটিলিন-ও ব্যবহৃত হয়, সঙ্গে উদ্‌বেগ বা অবসাদ রোগ থাকলে তার চিকিৎসা করতে হয়। মনশ্চিকিৎসার ক্ষেত্রে মূলত কগনিটিভ বিহেভিয়ারাল থেরাপি করা হয়। কিছু রোগীকে পেন কনট্রোল ক্লিনিকে বহির্বিভাগে বা প্রয়োজনে ভর্তি করে চিকিৎসা করা হয়। সেখানে নানা রকম ব্যায়াম এবং পুনর্বাসনের শিক্ষা হয়। এছাড়া সাথে চলে মনশ্চিকিৎসা এবং ওষুধের ব্যবহার। এই ধরনের সার্বিক প্রক্রিয়ায় রোগীর বেশ উৎসাহব্যঞ্জক উন্নতি দেখা গেছে।

এই শারীরিক উপসর্গের রোগীরা অধিকাংশ ক্ষেত্রে তাঁদের পরিবার বা বন্ধুবান্ধবের কাছে উপহাসের পাত্র হয়ে ওঠেন। তাঁদের ‘মাথার রোগী’ ছাপ দিয়ে তাঁদের শরীরে কষ্টের সাথে মনের কষ্টও বাড়িয়ে দেওয়া হয়, যেটা তাঁদের অবসাদ ও উদ্‌বেগ রোগের কারণ হয়। কিন্তু আমাদের মনে রাখতে হবে তাঁদের কাছে কিন্তু এই রোগের যন্ত্রণা সত্যিকারেরই, কোনো ‘ভান’ নয়। তাই তাঁদের সঠিক চিকিৎসার মাধ্যমে এই যন্ত্রণার উপশম উচিত। স্বাস্থ্যের বৃত্তে

ডা. সুমিত দাশ, এমবিবিএস, ডিপিএম, মনোরোগ বিশেষজ্ঞ, প্রাইভেট প্র্যাকটিস করেন। শ্রমজীবী মানুষের জন্য তৈরি একটি ক্লিনিকের সঙ্গে যুক্ত আছেন।

Advt.

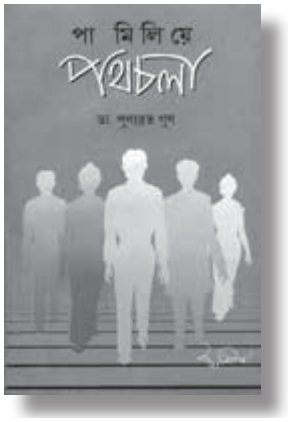

দেশে বেসরকারি মেডিক্যাল কলেজের লাগামছাড়া খরচের জন্য বিদেশে ডাক্তারি পড়তে যাওয়ার প্রবণতা বাড়ছে

পিয়ালী দে বিশ্বাস

যেখানে দেশের মাটিতে মেডিক্যাল কলেজের একটি সিটের দাম উঠছে কম-বেশি এক কোটি টাকা, সেখানে বিদেশে গিয়ে কম খরচে ডাক্তারি পড়ার আগ্রহ বাড়ছে এদেশের ছাত্র-ছাত্রীদের মধ্যে। আর তাতে সায় দিচ্ছেন অভিভাবকরাও।

সম্প্রতি বিদেশি মেডিক্যাল কলেজের প্রতিনিধিরা এক মেলার আয়োজন করেছিলেন রোটারি সদনে। প্রায় উনিশটি দেশ থেকে প্রতিনিধিরা এসেছিলেন। কথা বলে দেখা গেল ন্যূনতম ১০ লাখ ৪০ হাজার টাকা খরচ করতে পারলেই মিলবে ডাক্তারি পড়ার সুযোগ। আমাদের রাজ্যে NEET দিয়ে সরকারি কলেজে ডাক্তারি পড়তে খরচ পড়ে সাড়ে চার বছরে ৪০ হাজার ৫০০ টাকার মতো। অন্যদিকে NEET পাশ করে বেসরকারি মেডিক্যাল কলেজে পড়ার খরচ প্রায় ৯ লাখ ১০ হাজার টাকা।

কিন্তু যদি NEET পাশ না করা যায়, তাহলে উপায় দু-টি। কলেজের স্থানীয় প্রবেশিকা পরীক্ষা পাশ করে ম্যানেজমেন্ট কোটায় ভর্তি হওয়া, তাতে মোট খরচ ৪০ লাখ ৫০ হাজার টাকা। আর ম্যানেজমেন্ট কোটায় কৃতকার্য হতে না পারলে আছে এন আর আই কোটা। সম্প্রতি রাজ্যের বেসরকারি একটি মেডিক্যাল কলেজে এন আর আই কোটার একটি সিটের দর উঠেছে দেড় কোটি টাকা। এই বিপুল অর্থের তুলনায় বিদেশে মেডিক্যাল পড়ার খরচ অনেক কম। বিশেষজ্ঞদের মতে এই কারণেই বিদেশে মেডিক্যাল পড়তে যাওয়ার একটি ট্রেন্ড তৈরি হয়েছে। বিদেশে ছাত্রদের পাঠানোর জন্য গড়ে উঠেছে বেশ কিছু ব্যাবসায়িক এজেন্সি।

মেলায় এমন একটি সংস্থার প্রতিনিধিদের সঙ্গে কথা বলে জানা গেল এই বছর এখনও পর্যন্ত প্রায় ৬ হাজার পড়ুয়া বিদেশে গেছেন ডাক্তারি পড়তে। ক্রমশ এই সংখ্যা বাড়ছে।

বিদেশের ক্ষেত্রে সবচেয়ে জনপ্রিয় গন্তব্য বাংলাদেশ। কারণ বাংলাদেশের আবহাওয়া, রোগের ধরন, মানুষের জীবনযাত্রা প্রায় আমাদের দেশের মতো। একে তো ডাক্তারি পড়ার খরচ কম, সে সঙ্গে ভিন্ন দেশ হলেও পশ্চিমবঙ্গ-অসম-ত্রিপুরার মতো জায়গার ছাত্র-ছাত্রীরা বাংলা ভাষায় কথা বলার সুযোগ পায়, যা রোগী দেখার ক্ষেত্রে তাদের বিশেষ সুবিধা দেয়। পাশাপাশি বাংলাদেশে ডাক্তারি শেখানোর মাধ্যম ইংরেজি, সেই কারণে এই দেশের পড়ুয়াদের নতুন করে কোনো ভাষা শিখতে হয় না বা ভাষাগত কোনো সমস্যার সম্মুখীন হতে হয় না। শুধুমাত্র এই রাজ্য থেকে বাংলাদেশে ডাক্তারি পড়তে গেছেন প্রায় ১৬৫০ জন। বাংলাদেশে মোটামুটি ১১ লাখ টাকা থেকে ৩১ লাখ টাকায় ডাক্তারি পড়া যায়।

বাংলাদেশের পরেই পড়ুয়ারা ডাক্তারি পড়ার জন্য চীনকে বেছে নিচ্ছেন। চীনে এম বি বি এস পড়েছেন এমন এক ছাত্রের সঙ্গে কথা বলে জানা গেল এম বি বি এস-এর পরে উচ্চশিক্ষার জন্য বিদেশি ছাত্র-ছাত্রীদের বিশেষ সুবিধা পাওয়ার সুযোগ রয়েছে চীনে। চীনে এম বি বি এস পড়ার খরচ শুরু প্রায় ১৪ লাখ টাকা থেকে। চীনে ডাক্তারি পড়তে গেলে এক প্রবেশিকা পরীক্ষায় পাশ করতে হয়। চীন, রাশিয়া, ইউক্রেনের মতো দেশে ডাক্তারি পড়তে গেলে তিন বছরের এক ভাষা শিক্ষার কোর্স করা বাধ্যতামূলক। চীনের পরেই বেশি সংখ্যক ছাত্র-

ক্রমিক	মেডিক্যাল কলেজের নাম	দেশ	মহাদেশ	খরচ (টাকায়)	মন্তব্য
১	ঢাকা ন্যাশনাল মেডিক্যাল কলেজ	বাংলাদেশ	এশিয়া	৩১,২০,০০০ টাকা	এছাড়া হস্টেল ও খাবার খরচ বাবদ প্রতি মাসে ৬,৫০০ টাকা

ক্রমিক	মেডিক্যাল কলেজের নাম	দেশ	মহাদেশ	খরচ (টাকায়)	মন্তব্য
২	ডা. সিরাজুল ইসলাম মেডিক্যাল কলেজ, ঢাকা	বাংলাদেশ	এশিয়া	২৬,০০,০০০ টাকা	কেবল খাবার খরচ আলাদা
৩	ঢাকা কমিউনিটি মেডিক্যাল কলেজ	বাংলাদেশ	এশিয়া	২৭,৩০,০০০ টাকা	কেবল খাবার খরচ আলাদা
৪	জালালাবাদ রাগীব রাবেয়া মেডিক্যাল কলেজ, সিলেট	বাংলাদেশ	এশিয়া	২৭,৯১,৭৫০ টাকা	কেবল খাবার খরচ আলাদা
৫	আদ-দিন সাকিনা উইমেনস মেডিক্যাল কলেজ, যশোর	বাংলাদেশ	এশিয়া	১০,৪০,০০০ টাকা	কেবল খাবার খরচ আলাদা
৬	বসুন্ধরা আদ-দিন মেডিক্যাল কলেজ, ঢাকা	বাংলাদেশ	এশিয়া	১১,৭০,০০০ টাকা	থাকা খাওয়ার খরচ আলাদা
৭	নানজিং ইউনিভার্সিটি অব মেডিসিন	চীন	এশিয়া	১৪,৩০,০০০ টাকা/ একবারে দিলে ১৩,০০,০০০ টাকা	কেবল খাবার খরচ আলাদা
৮	এশিয়ান মেডিক্যাল ইনস্টিটিউট	কিরগিজস্তান	এশিয়া	১৬,৪৪,৫০০ টাকা	হস্টেল ও খাবার খরচ সহ
৯	ও এস এইচ স্টেট ইউনিভার্সিটি	কিরগিজস্তান	এশিয়া	১৪,৪৩,০০০ টাকা	কেবল খাবার খরচ আলাদা
১০	এ এম এ স্কুল অব মেডিসিন	ফিলিপাইনস	এশিয়া	১৭,৩৭,৫০০ টাকা	থাকা খাওয়ার খরচ আলাদা
১১	ম্যানিলা সেন্ট্রাল ইউনিভার্সিটি	ফিলিপাইনস	এশিয়া	২৪,৯২,২৯৯ টাকা	থাকা খাওয়ার খরচ আলাদা
১২	ভিনিস্টা ন্যাশনাল মেডিক্যাল ইউনিভার্সিটি	ইউক্রেন	ইউরোপ	২০,২৮,০০০ টাকা	
১৩	ক্রিমিয়া স্টেট মেডিক্যাল ইউনিভার্সিটি	রাশিয়া	ইউরোপ	১৩,৯৭,৫০০ টাকা	থাকা খাওয়া সহ
১৪	মায়কপ মেডিক্যাল ইউনিভার্সিটি	রাশিয়া	ইউরোপ	১৬,৫৭,৫০০ টাকা	খাওয়া খরচ আলাদা
১৫	এভালন ইউনিভার্সিটি স্কুল অব মেডিসিন, কুরাকাও	ক্যারিবিয়ান দ্বীপপুঞ্জ		৬১,৫০,০০০ টাকা	থাকা খাওয়া, ভারতে প্রসেসিং ফি সহ

ক্রমিক	মেডিক্যাল কলেজের নাম	দেশ	মহাদেশ	খরচ (টাকায়)	মন্তব্য
১৬	ওয়াশিংটন ইউনিভার্সিটি অব হেলথ অ্যান্ড সায়েন্স			৩৯,৬০,০০০ টাকা	থাকা খাওয়া, ভারতে প্রসেসিং ফি সহ
১৭	আলেকজান্ডার আমেরিকান ইউনিভার্সিটি স্কুল অব মেডিসিন	গায়না	দক্ষিণ আমেরিকা	৩১,০০,০০০ টাকা	থাকা খাওয়া সহ
১৮	ইউনিভার্সিটি অব পারপেচুয়াল হেল্প			১৫,৮৭,৫০০ টাকা	থাকা খাওয়ার খরচ আলাদা

ছাত্রীরা পা বাড়াচ্ছেন ইউক্রেন আর রাশিয়ার দিকে। ইউক্রেনের বিভিন্ন মেডিক্যাল কলেজে পড়ার খরচ প্রায় ১৩ লাখ টাকার মতো। পাশাপাশি রাশিয়ার বিভিন্ন মেডিক্যাল কলেজে খরচ ১৪ লাখ থেকে শুরু করে ২০ লাখ টাকার মতো। বিদেশের কোনো কোনো কলেজে এই খরচের সঙ্গে থাকা-খাওয়ার জন্য মাসে ৬,৫০০ টাকার মতো খরচ পড়ে।

বিদেশে খরচ কম হওয়া সত্ত্বেও কিছু সমস্যা রয়েছে। মেডিক্যাল কাউন্সিল অব ইন্ডিয়ার নিয়ম অনুযায়ী অন্য দেশ থেকে ডাক্তারি পড়ে এদেশে ডাক্তারি করতে হলে একটি স্ক্রিনিং টেস্ট উতরোতে হয়। এই পরীক্ষায় পাশ করলে তবেই মেডিক্যাল কাউন্সিলের রেজিস্ট্রেশন পাওয়া যায়। এই পরীক্ষায় পাশের হার মোটামুটি ১৫%। নিন্দুকেরা বলেন যাতে দেশের বেসরকারি মেডিক্যাল কলেজে না পড়ে ছাত্র-ছাত্রীরা বিদেশে চলে না যায় তাই অহেতুক এই স্ক্রিনিং টেস্টকে কঠিন করে রাখা হয়েছে। স্বাস্থ্যের বৃত্তে

লেখক একটি বাংলা দৈনিকের সাংবাদিক।

ভুল স্বীকার

স্বাস্থ্যের বৃত্তে আগস্ট-সেপ্টেম্বর ২০১৮ সংখ্যায় তিনটি বড়ো ভুল থেকে গেছে।

১. প্রচ্ছদে লেখা হয়েছে "পায়ের শিরা মোটা হয়ে গেছে? বিপদ হতে পারে"। কিন্তু ভিতরে যে প্রবন্ধটি আছে তা হল "শিরার মধ্যে রক্ত জমে যাওয়া (ডিভিটি)"। দু-টি বিষয় এক নয়।

২. হোমিয়োপ্যাথি নিয়ে যে নিবন্ধটি "হোমিয়োপ্যাথি: একটি আলোচনা" বেরিয়েছে, তাতে ভুলক্রমে লেখক হিসাবে ডা. অর্কবৈরাগ্য-র নাম দেওয়া হয়েছিল। ওই নিবন্ধটি আসলে ডা. সৌম্যকান্তি পণ্ডার লেখা।

৩. ডা. সব্যসাচী সেনগুপ্তের "অমৃতস্য পুত্রা" নিবন্ধে (পৃষ্ঠা ৩৪, লাইন ৬, ". . . তোমার বাচ্চা কাঁদছে তো বউমা, তার মানে তোমার বুকে দুধ হচ্ছে" . . . এসব ভাটের কথা।"

এর পরিবর্তে ". . . তোমার বাচ্চা কাঁদছে তো বউমা, তার মানে তোমার বুকে দুধ হচ্ছে না . . . এসব ভাটের কথা।" পড়তে হবে।

স্বাস্থ্যের বৃত্তে-র সম্পাদকমণ্ডলী এই ত্রুটির জন্য অত্যন্ত দুঃখিত এবং লেখক ও পাঠকদের কাছে ক্ষমাপ্রার্থী।

প্রতিবেদন

প্যান ৪০ অম্বল কমাতে নাও পারে, মনোসেফ-ও-ক্ল্যাভাম-ট্যাক্সিম-ও জীবাণুসংক্রমণ নিয়ন্ত্রণ নাও করতে পারে

নামি কোম্পানি মানেই ভালো ওষুধ এমনটাই আমরা ভাবি, আমাদের ভাবনায় উৎসাহ জোগান ডাক্তাররা অনেকে। কিন্তু ২ আগস্ট, ২০১৮-এ প্রকাশিত রাজস্থান সরকারের ড্রাগ কন্ট্রোল অর্গানাইজেশনের এক বুলেটিন আমাদের অন্যভাবে ভাবতে বাধ্য করবে। রাজস্থানের ড্রাগ কন্ট্রোল দেশের ড্রাগ কন্ট্রোলার জেনরাল ছাড়াও এই বুলেটিন পাঠিয়েছেন অন্য রাজ্যের ড্রাগ কন্ট্রোলারদের, যাতে এই ব্যাচের ওষুধগুলো ব্যবহার না করা হয়, বাজার থেকে যাতে ব্যাচগুলো তুলে নেওয়া হয়।

১৩টা কোম্পানির ১৭টা ব্র্যান্ড, ১৮টা ব্যাচ পরীক্ষায় ফেল করেছে। কোম্পানিগুলোর মধ্যে আছে সিপলা, এরিস্টো, এলকেম, সান ফার্মার মতো নামি কোম্পানি। ব্র্যান্ডগুলোর মধ্যে আছে মন্টেয়ার এলসি, মনোসেফ-ও, ক্ল্যাভাম ৬২৫, ট্যাক্সিম-ও, প্যান ৪০-র মতো বহুল প্রচলিত ব্র্যান্ড।

প্যান্টোপ্রাজোল ও ডমপেরিডনের (অযৌক্তিক) মিশ্রণ Cupan-D-তে ডমপেরিডন নেই। মন্টেলুকাস্ট সোডিয়াম ও লিভোসেট্রিজিন হাইড্রোক্লোরাইডের মিশ্রণ Montair-LC-তে মন্টেলুকাস্ট নেই। প্যান্টোপ্রাজোল ট্যাবলেট Pantop 40-তে নেই প্যান্টোপ্রাজোল। জীবাণুনাশক সেফপোডক্সিম ট্যাবলেট Monocef-O 200-এ সেফপোডক্সিম নেই। জীবাণুনাশক অ্যামোক্সিসিলিন ও পটাশিয়াম ক্লাভুলানেট ট্যাবলেট Clavam 625-এ ক্লাভুলানিক এসিড একটুও নেই। ক্যালশিয়াম ও ভিটামিন ডি৩-র চিবিয়ে খাওয়ার বড়ি Cal D3 tablets-এ ভিটামিন ডি৩ নেই। প্যান্টোপ্রাজোল ট্যাবলেট Pan 40-তেও প্যান্টোপ্রাজোল নেই।

প্যান্টোপ্রাজোল সোডিয়াম ও ডমপেরিডনের সাস্টেন্ড রিলিজ ক্যাপসুল Pantop-DSR-এ প্যান্টোপ্রাজোলের বদলে পাওয়া গেছে ওমিপ্রাজোল। জীবাণুনাশক সেফিক্সিম ট্যাবলেট Taxim-O 200-তে সেফিক্সিমের বদলে পাওয়া গেছে ওফ্লক্সাসিন। প্যান্টোপ্রাজোল সোডিয়াম ও ডমপেরিডন সাস্টেন্ড রিলিজ ক্যাপসুল Pantocid DSR-এও প্যান্টোপ্রাজোলের বদলে পাওয়া গেছে ওমিপ্রাজোল।

Pantop-DSR-এ ডমপেরিডন যতটা থাকার কথা আছে তার মোটামুটি এক-তৃতীয়াংশ। Pantocid DSR-এও তাই। জীবাণুনাশক এজিথ্রোমাইসিন ট্যাবলেট Aziprime-250 tablets-এ এজিথ্রোমাইসিন আছে যা থাকার, তার ৩১%। ডায়াবেটিসের ওষুধ গ্লিমিপিরাইড ও মেটফরমিন হাইড্রোক্লোরাইডের (অযৌক্তিক মিশ্রণ) Glimicut-M1-এ গ্লিমিপিরাইড যা থাকার কথা, তার মোটামুটি ১৮% আছে। উচ্চরক্তচাপের ওষুধ টেলমিসারটান ট্যাবলেট Temi-40 টেলমিসারটান আছে যা থাকার, তার প্রায় ২৩%। প্যান্টোপ্রাজোল ও ডমপেরিডন ট্যাবলেট Top-D-তে দু-টি ওষুধই কম পরিমাণে আছে।

বিবেক ফার্মাকেমের স্টেরয়েড হাইড্রোকর্টিজোন সোডিয়াম সাক্সিনেট ইঞ্জেকশন ১০০ মিলিগ্রাম জীবাণুমুক্ত নয়।

ক্রমিক নং	ওষুধের নাম	ব্যবহার	ব্যাচ নং/ এক্সপাইরি	প্রস্তুতকারী কোম্পানি	কারণ
১.	প্যান্টোপ্রাজোল ও ডমপেরিডন ট্যাবলেট (Cupan-D)	আলসারের ওষুধ, অম্বল-বুকজ্বালা	G527/480, অক্টোবর ২০১৮	এলফিন ড্রাগস প্রাইভেট লিমিটেড	নমুনায় ডমপেরিডন নেই।
২.	মন্টেলুকাস্ট সোডিয়াম ও লিভোসেট্রিজিন হাইড্রোক্লোরাইড ট্যাবলেট (Montair-LC)	অ্যালার্জিজনিত সর্দি-কাশি	SA65947, সেপ্টেম্বর ২০১৮	সিপলা লিমিটেড	নমুনায় মন্টেলুকাস্ট নেই। লিভোসেট্রিজিন আছে যা থাকার কথা, তার ১১৮.৮%।

ক্রমিক নং	ওষুধের নাম	ব্যবহার	ব্যাচ নং/ এক্সপাইরি	প্রস্তুতকারী কোম্পানি	কারণ
৩.	প্যান্টোপ্রাজোল সোডিয়াম ও ডমপেরিডন সাস্টেন্ড রিলিজ ক্যাপসুল (Pantop-DSR)	আলসারের ওষুধ, অম্বল-বুকজ্বালা	B452J037, আগস্ট ২০১৯	এরিস্টো ফার্মাসিউটিকাল প্রাইভেট লিমিটেড	নমুনায় প্যান্টোপ্রাজোলের বদলে ওমেপ্রাজোল আছে প্রতি ক্যাপসুলে ২০.৩২ মিলিগ্রাম ডমপেরিডন আছে যা থাকার কথা তার ৩৬.৮৭%।
৪.	প্যান্টোপ্রাজোল ট্যাবলেট (Pantop 40)	আলসারের ওষুধ, অম্বল-বুকজ্বালা	S171K017 মার্চ ২০২০	এরিস্টো ফার্মাসিউটিকাল প্রাইভেট লিমিটেড	নমুনায় প্যান্টোপ্রাজোল নেই।
৫.	সেফপোডক্সিম ট্যাবলেট ২০০ মিলিগ্রাম (Monocef-O 200)	জীবাণুনাশক	B198H197 জুলাই ২০১৯	এরিস্টো ফার্মাসিউটিকাল প্রাইভেট লিমিটেড	নমুনায় সেফপোডক্সিম নেই।
৬.	সেফপোডক্সিম ট্যাবলেট ২০০ মিলিগ্রাম (Monocef-O 200)	জীবাণুনাশক	B198J017 আগস্ট ২০১৯	এরিস্টো ফার্মাসিউটিকাল প্রাইভেট লিমিটেড	নমুনায় সেফপোডক্সিম নেই।
৭.	অ্যামোক্সিসিলিন ও পটাশিয়াম ক্লাভুলানেট ট্যাবলেট (Clavam 625)	জীবাণুনাশক	7170784 মার্চ ২০১৯	এলকেম ল্যাবরেটরিস লিমিটেড	যতটা থাকার কথা ততটা অ্যামোক্সিসিলিন নেই। ক্ল্যাভুলানিক অ্যাসিড একটুও নেই।
৮.	ক্যালশিয়াম ও ভিটামিন ডি৩ চিবিয়ে খাওয়ার বড়ি (Cal D3 tablets)	খনিজ ও ভিটামিন	GSMT-019 সেপ্টেম্বর ২০১৮	ল্যাবোরেট ফার্মাসিউটিকাল ইন্ডিয়া লিমিটেড	নমুনায় ভিটামিন ডি৩ নেই।
৯.	সেফিক্সিম ট্যাবলেট (Taxim-O 200)	জীবাণুনাশক	7181490 আগস্ট ২০১৯	এলকেম হেলথ সায়েন্স	নমুনায় সেফিক্সিম নেই, আছে ওফ্লক্সাসিন ২০৭.৬২ মিলিগ্রাম প্রতি ট্যাবলেটে।
১০.	প্যান্টোপ্রাজোল ট্যাবলেট (Pan 40)	আলসারের ওষুধ, অম্বল-বুকজ্বালা	7133275 এপ্রিল ২০২০	এলকেম ল্যাবরেটরিস লিমিটেড	নমুনায় প্যান্টোপ্রাজোল নেই।
১১.	প্যান্টোপ্রাজোল সোডিয়াম ও ডমপেরিডন সাস্টেন্ড রিলিজ ক্যাপসুল (Pantocid DSR)	আলসারের ওষুধ, অম্বল-বুকজ্বালা	EMS 2060 জুন ২০১৯	সান ফার্মা ল্যাবোরেটরিস লিমিটেড	নমুনায় প্যান্টোপ্রাজোল নেই, আছে ওমেপ্রাজোল ২১.৬৯ মিলিগ্রাম প্রতি ক্যাপসুলে। ডমপেরিডন আছে যা থাকার কথা, তার ৩৭.০৭%।

ক্রমিক নং	ওষুধের নাম	ব্যবহার	ব্যাচ নং/ এক্সপাইরি	প্রস্তুতকারী কোম্পানি	কারণ
১২.	অ্যাজিথ্রোমাইসিন ট্যাবলেট (Azi-prime-250 tablets)	জীবাণুনাশক	TNAP-476 আগস্ট ২০১৮	একুরেট ফার্মাসিউটিকালস	অ্যাজিথ্রোমাইসিন আছে ৭৭.৩৪ মিলিগ্রাম অর্থাৎ যা থাকার কথা তার ৩০.৯৪%।
১৩.	গ্লিমিপিরাইড ও মেটফরমিন হাইড্রোক্লোরাইড ট্যাবলেট (Glimic-ut-M1)	ডায়াবেটিসের ওষুধ	AP6334 অক্টোবর ২০১৮	এফি প্যারেন্টেরালস	নমুনায় গ্লিমিপিরাইড আছে ০.১৮৪৮ মিলিগ্রাম অর্থাৎ যা থাকার কথা তার ১৮.৪৮%।
১৪.	টেলমিসারটান ট্যাবলেট (Temi-40)	উচ্চরক্তচাপের ওষুধ	DVTC1672 আগস্ট ২০১৮	ডিজিটাল ভিশন	গড়ে যা ওষুধ থাকার, নমুনায় তার ২২.৯৯% আছে।
১৫.	ক্যালশিয়াম, ম্যাগনেশিয়াম হাইড্রোক্সাইড এবং কোলিক্যালসিফেরল সাসপেনশন (Calijon D3 suspension 200 ml)	খনিজ ও ভিটামিন	YS-7048 অক্টোবর ২০১৮	য়াক্কা লাইফ সায়েন্সেস প্রাইভেট লিমিটেড	কোলিক্যালসিফেরল যা বলা আছে তা নেই।
১৬.	ডাইক্লোফেনাক সোডিয়াম ট্যাবলেট ৫০ মিলিগ্রাম	বেদনানাশক	DFT17013 আগস্ট ২০১৯	বিবেক ফার্মাকেম (আই) লিমিটেড	ওষুধের ওজন ঠিক নেই।
১৭.	হাইড্রোকর্টিজোন সোডিয়াম সাক্সিনেট ইঞ্জেকশন ১০০ মিলিগ্রাম	স্টেরয়েড	HCL16048 জুলাই ২০১৮	বিবেক ফার্মাকেম (আই) লিমিটেড	জীবাণুমুক্তির পরীক্ষায় উতরোয়নি।
১৮.	প্যান্টোপ্রাজোল ও ডমপেরিডন ট্যাবলেট (Top-D)	আলসারের ওষুধ, অম্বল-বুকজ্বালা	G-177 আগস্ট ২০১৮	কেয়ার-ওয়েল হেলথকেয়ার	প্যান্টোপ্রাজোল আছে ৩১.৫৮ মিলিগ্রাম (যা থাকার কথা, তার ৭৮.৯৫%)। ডমপেরিডন আছে ৭.৭৬ মিলিগ্রাম (যা থাকার কথা, তার ৭৭.৬%)।

এমনটাই যদি অবস্থা হয় তাহলে নামি কোম্পানিগুলোকে বিশ্বাস করে কী লাভ? কোম্পানির মুখপাত্ররা অনেকেই ইতিমধ্যে বলা শুরু করেছেন যে অভিযুক্ত ব্যাচগুলো তাদের তৈরি করা নয়, ভেজাল ব্যাচ।

তেমনটাই তো হওয়ার কথা। দামি পণ্যের ভেজাল করাই তো লাভজনক। আর দামি কোম্পানির বেশি দাম তো কাঁচা মালের বেশি, উৎপাদন খরচ বেশি বা প্যাকেজিং-এর খরচ বেশি বলে নয়। দাম বেশির কারণ দামি ব্র্যান্ডগুলোর প্রচার-প্রসারের খরচ! স্বাস্থ্যের বৃত্তে

প্রতিবেদক: ডা. পুণ্যব্রত গুণ, এমবিবিএস, *স্বাস্থ্যের বৃত্তে* পত্রিকার যুগ্ম সম্পাদক এবং ওষুধের যুক্তিসঙ্গত ব্যবহারের আন্দোলনের কর্মী।